মান মানে কচু

নারায়ণ সান্যাল

অক্ষর ১৪১, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

মান মানে কচু

নারায়ণ সান্যাল

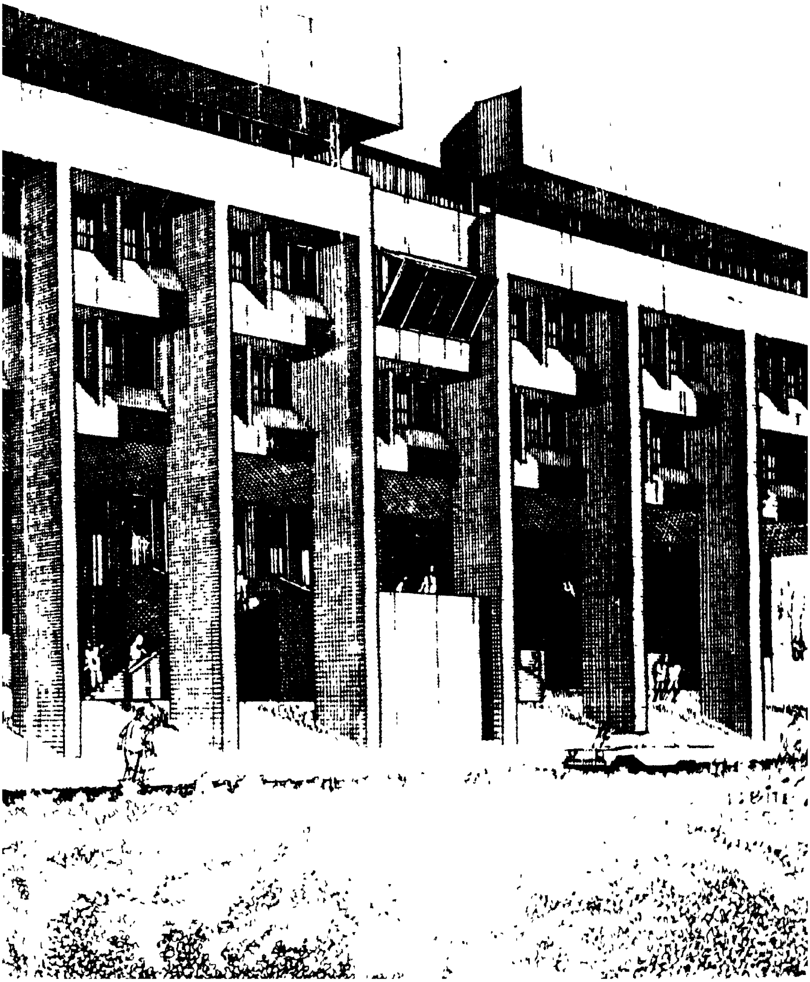

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি, ১৯৬৪

প্রকাশক
মতিউর রহমান
অক্ষর
১৪১ কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক
শ্রীবৈদ্যনাথ সামন্ত
জগদ্ধাত্রী প্রেস
৮১ / ১ই, রাজা দীনেন্দ্রনাথ স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ
দেবব্রত ঘোষ

পরিবেশক
অণিমা প্রকাশনী। ১৪১ কেশব সেন স্ট্রিট কলকাতা-৭০০০০৯
পিয়ালি বুকস। এ-৬৪ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০০০৭
চাঁপাডাঙা বইঘর। চাঁপাডাঙা কলেজ রোড হুগলী

ক্রি রিং-ক্রিং... ক্রিরিং-ক্রিং... ক্রিরিং-ক্রিং...

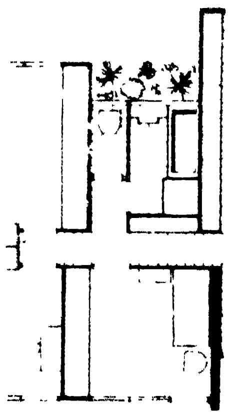

আঃ, জ্বালালে। প্রথমেই নজর পড়ল দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে: ছটা দশ। ঘুম-চোখে ডব্‌ল-বেড বিছানায় হাতটা বাড়িয়ে দিল। সেটা বাধা পেল না কোথাও। তার মানে অলকা উঠেছে। বাথরুমে আলো জ্বলছে; কিন্তু সেখানে ও নেই, কারণ রান্নাঘরে ঠুকঠাক্ শব্দ হচ্ছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না, মিঠুনের জন্যে টিফিন বানাতে ব্যস্ত। তার অর্থ: টেলিফোনটা ধর্মপত্নীর প্রায় নাগালের মধ্যে। অশোক নিশ্চিন্ত হয়ে শয্যাসঙ্গিনীর সাময়িক বিকল্প পাশবালিশটাকে আঁকড়ে পাশ ফেরে।

কিন্তু মুক্তি কি অতই সহজ?

নির্লজ্জ টেলিফোনটা ছিনে-জোঁক ভিখিরির মতো নাগাড়ে চিল্লে চলেছে: ক্রিরিং-ক্রিং ক্রিরিং-ক্রিং....

এতক্ষণে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ছাপিয়ে তার-সানাইয়ের ঝঙ্কারের মতো রান্নাঘর থেকে ভেসে এল গৃহস্বামিনীর বজ্রকণ্ঠ: শুনতে পাচ্ছ না? উঠে গিয়ে ধর না বাপু? আমার হাত জোড়া....

—মিঠুন কী করছে? সে ধরতে পারে না?—জড়িত কণ্ঠে জানতে চায় অশোক।

ছোট ফ্ল্যাটের ও-প্রান্ত থেকে ভেসে এল শিশু কণ্ঠে: আমি বাথরুমে বাপি—

ক্রিরিং-ক্রিং!....ক্রিরিং ক্রিং....

হেত্তেরি! লোকটার কি একটু কল্পনাশক্তিও নেই। আজ সোমবার, এখন সকাল ছ'টা। ধরেনে না বাপু—ওরা বাড়ি শুদ্ধ সবাই উইকেন্ডে কলকাতার বাইরে গেছে; এখনো ফেরেনি! হয়তো রঙ-নাম্বার! ঘুমটা ছুটিয়ে মিহিকণ্ঠে শোনাবে: সরি।

অশোক পায়জামার কষিটা সাঁটতে সাঁটতে শয়নকক্ষ ছেড়ে এগিয়ে আসে

বৈঠকখানায়! টেলিফোনটা সেখানে থাকে। রিসিভারটা উঠিয়ে নিয়ে বলে: সেভেন-ফাইভ এইট-ফোর সিক্স-ফোর।

এটাই কেতা। টেলিফোন তুলে প্রথমেই আত্মসংখ্যা ঘোষণা করতে হয়। নামটা অকিঞ্চিত, নম্বরটাই মুখ্য—হাজার-চুরাশির মায়ের মতো। তার নাম সতী, কি শ্যামা, কি লছমি সেটা বাহুল্য। জেলখানা-পাড়ায় হাজার-চুরাশি ইজ হাজার-চুরাশি। 'হ্যালো'টা ফালতু। 'হ্যালো' মানে কী? 'আমি শুনছি,বলো?' সে তো বটেই। রিঙিং টোন যখন থেমেছে তখন 'তুমি' ও-প্রান্তে কর্ণময়। কিন্তু 'তুমি' ব্যক্তিটি কে বট হে? আমার কাঙ্ক্ষিত 'তুমি', নাকি ব্যাকরণের নৈর্ব্যক্তিক সর্বনাম? নিজের নাম ঘোষণা করাও ক্ষেত্রবিশেষে নিরর্থক। হয়তো টেলিফোন করছে মিঠুনের সহপাঠী, পড়া জেনে নিতে। সে হয়তো মিঠুনের বাবার নামটাই জানে না, ফলে 'অশোক মুখার্জী স্পিকিং'-টাও সেক্ষেত্রে নিরর্থক। অশোক তাই সর্বদা আত্মসংখ্যা ঘোষণা করে। তাতে আরও একটা লাভ—এটা সবাই জানে না, 'রঙ-নাম্বার' হলে নিঃশব্দে যদি ও-প্রান্তবাসী ক্রেড্‌লে ফোনটা নামিয়ে রাখে তাহলে তার ফালতু কল চার্জ হয় না। ফলে, 'সরি, রঙ-নাম্বার' বলাটা বিনা পয়সার সৌজন্য নয়।

তাই অশোক আত্মসংখ্যাটাই ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল।

—মুকুর্জি সা'ব কব্ লৌটেঙ্গে?

—ক্যা মৎলব? কৌনসি মুখার্জী সা'ব?

—আর্কিটেক্ট অশোক মুকুর্জী সা'ব?

—জী হাঁ, ম্যায়হি বোলতা হুঁ। আপ কৌন? রামশরণজী কেয়া?

—কেয়া তাজ্জব! আপ ইহাঁ?

আপাদমস্তক জ্বালা করে ওঠাই স্বাভাবিক। এটা কী জাতের রসিকতা? একটি বিবাহিত সংসারী মানুষকে সকাল ছটায় বিছানা থেকে তুলে এনে বিস্ময় প্রকাশ করা: আপনি এখানে? যেন শুঁড়িখানার পাশের নর্দমায় ওর পড়ে থাকাটাই ছিল প্রত্যাশিত। অথবা প্রস্-কোয়ার্টার্সে!

সে-কথাই রসিকতা করে বলল অশোক। রামশরণ সে কৌতুকে আদৌ যোগ দিলেন না। একটু থতমত ভাব কাটিয়ে বললেন, লেকিন বাত ইয়ে হ্যয়....কেয়া কহুঁ....ম্যয়নে সুনা হ্যয় কি....আখবরমে লিখা হ্যয়....

অশোক ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দেয়। তার সাধ্যমতো হিন্দিতে বুঝিয়ে দেয়, আপনি ভুল শুনেছেন রামশরণজী। আকবর-বাদশা নিরক্ষর ছিলেন—বিলকুল আনপড়। নিজের নামটাও তিনি সই করতে পারতেন না। সারা জীবনে তিনি এক কলমও লেখেননি। কিন্তু সে-কথা থাক। আকবরের কিস্‌সা শোনাবার জন্য নিশ্চয় এই সাতসকালে আমাকে ঘুম থেকে টেনে তোলেননি। কাজের কথা কী আছে বলুন?

যুক্তিটা রামশরণ মেনে নিলেন : ও তো সহি বাৎ!

কাজের কথাটা অতঃপর দাখিল করেন। যে প্রস্তাবটা তিনি ইতিপূর্বে দিয়েছিলেন, যে-হেতুতে 'মুখার্জী অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেস্' আর্কিটেক্ট ফার্মের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি, সেই প্রস্তাবটা উনি প্রত্যাহার করতে চান।

—তার মানে ঐ প্লটে আপনি 'সিনেমা হল' তৈরী করবেন না?

—জী নেহি! আপ মেরি বাত নেহি সমঝা....পিকচার হৌস্ তো জরুর বনাইতে হোবে, লেকিন....

—লেকিন কেয়া?

—কাইসে বাতাউঁ...আপ্ তো খুদ্ই জানতে হেঁ...

মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কী বলতে চায় লোকটা?

সৎ এবং দক্ষ স্থপতি হিসাবে অশোক মুখার্জী সুনাম কিনেছে। মাত্র সাত বছরের প্র্যাকটিস। কিন্তু এরই মধ্যে ক্লায়েন্ট-পরম্পরায় ওর সুখ্যাতি শহরের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্গাপুর, বার্নপুর, চিত্তরঞ্জন, মায় জামসেদপুর থেকেও ইদানীং কাজ পেতে শুরু করেছে। অশোকের বিশ্বাস, তার মূল হেতু সে সি. বি. আর. আই, অথবা এন. বি. ও.র সাম্প্রতিকতম ব্যয়-সঙ্কোচ পদ্ধতিগুলি তার ডিজাইনে রূপায়িত করছে বলে। প্রতিযোগিতামূলক পার-স্কোয়্যারফুট খরচ কম পড়ছে বলে। রামশরণ কোথা থেকে ওর সন্ধান পেয়েছে জানা নেই। কিন্তু প্রায় মাসখানেক আগে রামশরণ আগরওয়াল একটি প্রস্তাব নিয়ে মুখার্জী কোম্পানির দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ডায়মন্ড-হারবারের কাছাকাছি জনবহুল এলাকাতে ওঁর একটা বড় ফাঁকা প্লট আছে। উনি সেখানে একটি সিনেমা হল তৈরি করাতে চান। ওঁর প্রস্তাব ছিল মুখুর্জী কোম্পানি তার নক্‌শা 'খিঁচবেন'। মৌখিক কথাবার্তা হয়েছে, পার্সেন্টেজ স্থির হয়েছে। শুধু প্ল্যান ও এস্টিমেট করে দেবার কথা। লেখাপড়া এখনো কিছু হয়নি। কারণ রামশরণ চাইছেন মুকুর্জী-সাব দেখ্-ভাল করে পিকচার-হৌসটা বনাইয়ে ভি দেবেন, কিন্তু অশোক সুপার্ভিশানের দায়িত্ব নিতে চাইছিল না। কারণ সুভারভিশনের দায়িত্ব মানেই পেট্রল পুড়িয়ে সপ্তাহে দু তিনদিন কাজ স্বচক্ষে দেখতে যাওয়া। আজকাল কারও উপর দায়িত্ব দিতে ভরসা হয় না। রাজনৈতিক দাদাদের চরিত্রহীনতা যেন সমস্ত সমাজ-দেহে সংক্রামিত হয়ে গেছে। যে-যেভাবে পারে পয়সা কামাতে উদ্যত। শুধু দূরত্বের জন্যই ও সুভারভিশনের দায়িত্ব নেবে না বলেছে। তবে প্ল্যান, এস্টিমেট আর আর্কিটেক্চারাল ডিটেলস্ বাবদ না হোক বিশ হাজার টাকার বিল হত। ফলে সাত-সকালে এই বিনা মেঘে বজ্রাঘাতে বেচারি স্তম্ভিত। হেতুটা কী, তা রামশরণজী কিছুতেই স্বীকার করলেন না। লোকটা যদি বলত ' সিনেমা হল' আদৌ সে বানাবে না, অথবা এ টাকা সে এখনই বিনিয়োগ করতে চায় না, কিংবা ঐ জাতের কিছু, তাহলে একটা অর্থ বোঝা যায়। সে সব কিছুই ও স্বীকার করছে না। অশোক বারে বারে জানতে

চায়, তাহলে হেতুটা কী? আরও সস্তায় কেউ নক্‌শা করে দিতে রাজি হয়েছে?

—জী নেহি! লেকিন আপ্‌ তো মেরি বাত শুন্‌তেহি নেহি! ম্যয়নে খুদ নেহি দেখা, লেকিন মেরা মুনিমজীনে কহ্‌তা হ্যয় কি আকবরমে লিখা হ্যয়....

—দুত্তোর নিকুচি করেছে! ওসব 'আকবর-জাহাঙ্গীর' ছাড়ুন তো! আপনি কখন আমার অফিসে আসতে পারবেন? এসব কথা টেলিফোনে মিটবে না....

—মুঝে মাফি কিয়া যায় মুকুর্জী-সাব! ম্যয়নে আপ্‌কী দফতরমে আনে নেহি সেকুঙ্গা। লেকিন ম্যয়নে মান্‌লি....হ্যাঁ, রামশরণ অকৃতজ্ঞ নয়। সে স্বীকার করছে, তার জবান মোতাবেক মুকুর্জী-সাব ইতিমধ্যেই কুছু টাইম ওয়েস্ট 'করিয়েসেন'। জমিনভি দেখে এসেছেন। এ-ক্ষেত্রে মুখার্জী অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট্‌স্‌ যদি একটা 'কন্‌সাল্টেশন ফি'র বিল পাঠিয়ে দেয় তাহলে রামশরণজী সেটা পেমেন্টের ইন্তেজাম করবেন।

অশোক আরও কিছু বল্‌তে চাইছিল, কিন্তু 'রাম-নামে'র দ্বিত্ব-প্রয়োগান্তে ও-প্রান্তবাসী যন্ত্রটা ক্রেড্‌ল-এ নামিয়ে রাখল।

আশ্চর্য! ব্যাপার কী? লোকটা রাতারাতি এভাবে বদলে গেল কেন? গতকালও সে পীড়াপীড়ি করেছে 'পিকচার হৌস'-এর 'সুপারভিশান' অশোককে দিয়ে করাতে চায়। ক্রেড্‌লে টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে ঘুরে দাঁড়ায়। দেখে, মিঠুনের জন্য খাবার আর দুধের গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে অলকাও অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই বলল, রামশরণজী না?

—হ্যাঁ, চিনতে পেরেছ দেখছি।

—কেন পারব না? এইতো কদিন আগে ওঁর গাড়িতে ডায়মন্ড-হারবার ঘুরে এলাম সবাই....

—ও হ্যাঁ, তোমরাও তো গেছিলে সঙ্গে....

—কী বলছেন রামশরণজী?

—বলছে, সিনেমা-হাউসটা আমাকে দিয়ে বানাবে না। কিন্তু কেন হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত কিছুতেই ভাঙল না।

—হয়তো ঐ প্লটে অন্য কিছু বানাতে চায়....

—তুমি আমার কথাটা মন দিয়ে শোননি, অলকা। ও একথা বলছে না যে, সিনেমা-হল সে বানাবে না; এ-কথা বলছে না যে, আপাতত ঐ অর্থ বিনিয়োগ করতে চায় না....

—তাহলে কী?

—সেটাই তো ভাবছি আমি। গতকাল দুপুরেও লোকটা আমার অফিসে এসে পীড়াপীড়ি করেছে যাতে সুপারভিশানের দায়িত্ব আমরা নিই; আর আজ মনে হচ্ছে ও আমাকে কোন সংক্রামক রোগীর মতো পরিহার করতে চায়! কেন? রাতারাতি কী এমন হল?

মিঠুন স্কুল-ড্রেস পরে ডাইনিং টেব্‌লে এসে বসে। অলকার এখন ডানে-বাঁয়ে তাকানোর সময় নেই। মিঠুনের খাবারটা টেবিলে নামিয়ে সে আবার রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে। ফুটন্ত চায়ের কেটলিটা তাগাদা দিচ্ছে।

অশোক বাথরুমের দিকে এগিয়ে যায়। মিঠুন, দীপু আর সোমাকে স্কুলে পৌঁছে দেবার দায়িত্বটা আজ অশোকের। ওরা 'তিন দুকুনে ছয়'- এর হিসাবে দায়িত্বটা ভাগাভাগি করে নিয়েছে। সোম, আর শুক্র অশোকের পালা। মঙ্গল আর শনি দীপুর বাবা সিতাংশু চৌধুরী, বুধ আর বৃহস্পতি সোমাব মা ড্রাইভ করে তিনটি বাচ্চাকেই নিয়ে যান। স্কুল কাছেই, তবে বড় রাস্তার ওপারে। তাই এই ব্যবস্থা। ওদের ছুটি হয় বারোটা দশে। তখন মায়েরা গিয়ে স্কুল থেকে বাচ্চাদের ফিরিয়ে আনে। কর্তারা তখন যে যার কর্মস্থলে। মায়েবা নিজেদের মধ্যে ফোনে স্থির করে নেয়, কে কবে 'ভাগের-মা' হচ্ছে।

আবার বেজে উঠল টেলিফোনটা।

এবার অলকাই এগিয়ে এসে ফোনটা তুলে নেয় : হ্যালো!

অশোকের যাবতীয় যুক্তি-তর্ক ওর জানা, কিন্তু অভ্যাস যাবে কোথায়? প্রাকবিবাহ জীবনের অভ্যাসটা আজও আছে। টেলিফোন তুলেই বলা : হ্যালো!

ও-প্রান্তবাসিনী বলে, অলকা? আমি মালতী বল্‌ছি---

—হ্যাঁ, বল?

—ইয়ে হয়েছে...মানে, চৌধুরী বলছিল মিঠুনকে আজ ও নিজেই পৌঁছে দিতে পারে...মানে, মিঠুন কি আজ 'অ্যাট অল' স্কুলে যাবে?

প্রশ্নেব ধরতাইটা ঠিক মতো ধরতে পারে না অলকা। শুধু প্রশ্নটাই নয়, বাচনভঙ্গিটাও। এত আম্‌তা-আম্‌তা করছে কেন মালতী! বললে, মানে? আজ তো অশোকই ওদের নিয়ে যাবে। আজ তো সোমবার।

—অশোকদা কোথায়?

—বাথরুমে। কেন?

ও-প্রান্তে নীরবতা। অলকা আবার জানতে চায়, কী ব্যাপার বলতো মালতী? ও আজ স্কুলে নিয়ে যেতে পারবে না এ-কথা মনে হল কেন তোমার?

মনে হল ও-প্রান্তে রিসিভারটার হাতবদল হল। বুঝতে অসুবিধা হয় না, এতক্ষণ মালতীর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল তার স্বামী। ভারী পুরুষালী কণ্ঠে এবার চৌধুরী বলে, আমি সিতাংশু বল্‌ছি।

—হ্যাঁ, বলুন? কী বলছেন?

—ইয়ে হয়েছে, মানে অশোক কি আজ ওদের স্কুলে পৌঁছে দেবার কথা ভাবছে? কী দরকার? আমি আজ ওদিকেই যাচ্ছি। মিঠুন যদি স্কুলে যেতে পারে, তাহলে আমিই তাকে পৌঁছে দেব। ইন্ ফ্যাক্ট, আমার মনে হয় তাকে স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল, এ অবস্থায়। তুমি কিছু চিন্তা কর না, মালতী দুপুরে ওকে স্কুল থেকে

ফিরিয়ে আনবে...

অলকা প্রায় ধমকে ওঠে, বাট হোয়াই? কেন? ঠিক কী বলতে চাইছেন বলুন তো? 'এ অবস্থায়' মানে কী? কোন্ অবস্থায়?

—অশোক কোথায়?

—এইমাত্র মালতীকে তা জানিয়েছি। বাথরুমে। কিন্তু এ প্রশ্ন বারে বারে কেন জানতে চাইছেন আপনারা?

—ও. কে, ও. কে! এটাই যদি তোমাদের স্ট্যান্ড হয়, তবে তাই। আমাদের মনে হয়েছিল এইরকম অবস্থায় আমাদের স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে....

—কোন রকম অবস্থায়? আপনি কিছু একটা গোপন করছেন। আপনারা দুজনেই! কী হয়েছে বলুন তো?

—কিছু নয়! আমরাই গোপন করতে চাইছি বটে! যা হোক, আমি আজ দীপুকে স্কুলে পৌঁছে দেব। অশোককে কষ্ট করতে হবে না।

—ইফ দ্যাট্স্ হোয়াট য়ু ওয়ান্ট! অল রাইট!

সশব্দে ক্রেড্লে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখে এবার। অশোক ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে নিয়েছে। সচরাচর মিঠুনকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে সে প্রাতঃরাশ সারে। এখন শুধু এক পেয়ালা চা। খবরের কাগজের হেড-লাইন নিউজের ওপর চোখ বুলাবার অবকাশে।

অশোক জানতে চায়, কে ফোন করছিল গো?

—সিতাংশুবাবু।

—সিতাংশু? কী ব্যাপার? দীপু আজ স্কুলে যাবে না?

—না, তা নয়। দীপুকে সীতাংশুবাবুই স্কুলে পৌঁছে দেবেন। তোমাকে কষ্ট করতে হবে না।

—কেন? আজ তো সোমবার?

—জানি। হঠাৎ কেন এ প্রস্তাব তা আমার মাথায় ঢোকেনি। প্রথমটায় মালতীই ফোন করে। পরে সে যখন হালে পানি না পেয়ে ডুবতে বসেছে তখন সিতাংশুবাবু তাকে অ্যাসিস্ট করতে—

—তার মানে?

—'তার মানে' আমার কাছে জানতে চেও না। আমার মগজে ঢোকেনি।

—তবু যেটুকু কথোপকথন হল...

অলকা কথোপকথনের সারমর্মটা জানায়। আদ্যোপান্ত শুনে অলোক বলে, স্ট্রেঞ্জ! রামশরণের অসংলগ্ন কথাবার্তার সঙ্গে বেশ একটা মিল আছে, মনে হচ্ছে না কি?

—মিল? কই আমার তো কিছু নজরে পড়ছে না।

—দুজনেই আমাকে পরিহার করতে চায়। দুজনেই ধরে নিয়েছে অশোক মুখার্জী

তার বাড়িতে অনুপস্থিত।

অলকার মেজাজটা খারাপ হয়ে গেছে। অহেতুক সিতাংশুবাবুকে দুটো কড়া কথা বলেছে বলে। কিন্তু সত্যিই অহেতুক কি? ওরা কিছু একটা খবর গোপন করতে চাইছিল।

সেটা কী—তাই তো অলকা জানতে চেয়েছে। সে চায়ের পেয়ালাটা টেনে নেয়।

মিঠুন ইতিমধ্যে ব্যাগে বই-খাতা-টিফিনবাক্স ভরে নিয়েছে। এবার সে স্কুলের পোশাক পরতে যায়।

অশোক খবরের কাগজটা টেনে নিয়েছে। প্রথম পাতার একটা খবরে সে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলে, দেখেছ অলকা? আবার একটা ফ্রেম-স্ট্রাকচার বাড়ি...গুড হেভেন্স্। সন্দীপ ধনপতিয়া....

—চেন লোকটাকে? —অলকা জানতে চায়।

—বিলক্ষণ! এ বাড়ি তো আমার ডিজাইনে!

—কী বলছ! তার মানে তোমারও দায়িত্ব আছে?

—বিন্দুমাত্র না! সাততলার পর অষ্টমতলা ঢালাইয়ের সময় বাড়িটা ভেঙে পড়ে। আমি ডিজাইন করেছিলাম শুধু মাত্র চারতলা বাড়ি। আমার আশঙ্কা ছিলই—সন্দীপ ধনপতিয়া এরকম একটা কিছু করতে যাচ্ছে। তাই আমি হাত ধুয়ে ফেলেছিলাম।

সে-কথা যথার্থ!

সন্দীপ ধনপতিয়া মধ্য কলকাতায় একটি পুরাতন একতলা বাড়ি ক্রয় করে সেটাকে ভেঙে সেখানে বহুতলবিশিষ্ট একটা প্রাসাদ বানানোর প্রস্তাব নিয়ে অশোক মুখার্জীর দ্বারস্থ হয়েছিল। অশোক জমি দেখে এসে জানায় রাস্তার যা বিস্তার এবং প্লটের যা মাপ তাতে চারতলার বেশি ওখানে তৈরী করা যাবে না। বহুতল-বিশিষ্ট বাড়ি অসম্ভব, এফ. এ. আর.-এ আটকাবে। ধনপতিয়া পীড়াপীড়ি করেও ওকে রাজি করাতে পারেনি। অশোক তাকে স্পষ্ট জানিয়েছিল, ধনপতিয়া কর্পোরেশন থেকে স্যাংশন করাতে পারবে কিনা সেটা প্রশ্নই নয়। লাইসেন্সড এবং বিবেকবান স্থপতি হিসাবে চারতলার চেয়ে বড় বাড়ির ডিজাইন তৈরি করাতে অশোকের নিজেরই আপত্তি। ধনপতিয়া সেসময় রাজি হয়ে যায়; কিন্তু জেদাজেদি করতে থাকে, একটা লিফ্ট-এর এন্তাজাম করতে হবে। অশোক বলেছিল, চারতলা পর্যন্ত লিফ্ট না বানালেও চলে। কিন্তু সন্দীপ ধনপতিয়া স্বীকৃত হয়নি; তার বক্তব্য, জমির মালিক এক বিধবা বুড়ি; সে উপরতলায় থাকবে তার ৺গোপালকে নিয়ে। ৺গোপালের মাথায় ভাড়াটেরা পদাঘাত করবে এটা বুড়ির পছন্দ নয়। আবার সে নিজে বেতো। ফলে লিফ্টটা চাইই। অশোক অগত্যা রাজি হয়ে যায়। চারতলা বাড়িই হবে। সবার উপরে ৺গোপালকে নিয়ে থাকবে জমির মালিক। নিচের তিনটি

তলায় ভাড়াটে। তাই লিফ্‌ট।কিন্তু বাড়ির কাজ শুরু হতে না হতে অশোক দেখল, ধনপতিয়া ফাউণ্ডেশনে অতিরিক্ত 'টর' রড দিচ্ছে; তখনই তার আশঙ্কা হয় লিফ্‌ট বানানোর উদ্দেশ্য অন্য কিছু; তাই সচরাচর আর্কিটেক্ট হিসাবে কর্পোরেশনের এলাকায় নক্শা দাখিল করলে যদিও সে সুপার্ভিশান-এর দায়িত্বও নেয়—বিশেষ যদি কাজটা কাছাকাছি হয়— কিন্তু এক্ষেত্রে সে স্বীকৃত হয়নি। সন্দীপ ধনপতিয়া ইতিপূর্বেও কলকাতা শহরে একাধিক বেআইনি প্রাসাদ বানিয়েছে। কোন ঘাটে কী পরিমাণ প্রণামী দিলে কাজ হাসিল হয় তা ওর জানা। চারতলা বাড়িতে জেদাজেদি করে সে যখন একটা লিফ্‌ট-রুম-এর স্যাংশন নিল তখনই অশোকের আশঙ্কা হয়েছিল—ধনপতিয়ার কিছু একটা দুরভিসন্ধি আছে। বেতো বুড়ি নয়, বেআইনি বহুতল বাড়ি নির্মাণ। তাই সুপার্ভিশান দায়িত্ব তো নেয়ইনি বরং সিটি আর্কিটেক্টকে লিখিত ভাবে জানিয়ে দেয় যে, সে ঐ বাড়ির নির্মাণ দায়িত্ব গ্রহণ করেনি।

সেই বাড়িটি যেমন করেই হোক সাততলা পর্যন্ত উঠে যায়। অষ্টম তলার ছাদ ঢালাইয়ের পরদিন হাড়গোড় ভেঙে বাড়িটা কালরাত্রে ভূতলশায়ী হয়েছে। ধ্বংসস্তূপে কতজন মেহনতী মানুষ চাপা পড়েছে তা এখনো নির্ধারিত হয়নি। দিনের বেলা ভেঙে পড়লে হয়তো কয়েক শ লোক জখম হত। ভাগ্যক্রমে বাড়িটা ভেঙে পরে রাত নটা নাগাদ। তখন মিস্ত্রি-মজুরেরা ছুটি করে চলে গেছে। শুধু কিছু দেহাতী বিহারী মজদুর ছিল একতলায়। তারা ওখানেই থাকে রাত্রে। হয়তো তাদের মধ্যে কয়েকজন...

কাগজে লিখেছে সন্দীপ ধনপতিয়া নিরুদ্দেশ। ঠিকাদারকে মধ্যরাত্রে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর্কিটেক্টকে— কাগজে তার নামটা জানানো হয়নি—তাঁর বাড়িতে পাওয়া যায়নি। হয়তো সেও আত্মগোপন করেছে, বাড়িটা ভেঙে পড়ার খবর পাওয়া মাত্র।

অলকা সংবাদের ঐ অংশে অশোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, এর মানে কী? আর্কিটেক্ট তো তুমি?

—না। ব্যাপারটা বুঝলে না? আমি চারতলা বাড়ির প্ল্যান সাবমিট করে যখন হাত ধুয়ে ফেললাম তখন ধনপতিয়া তার জানাশোনা কোনও আর্কিটেক্ট-এর মাধ্যমে সম্ভবত একটা 'রিভাইজড প্ল্যান' দাখিল করে। ঠিক জানি না, আমার আন্দাজ, সেটি কাগজে-কলমে স্যাংশন্‌ড হয়নি। হবার কথাও নয়। এ একটা কৌশল। প্রমোটার যেন বলতে চায়, 'রিভাইজড প্ল্যান' তো আমি দাখিল করেছি। আপত্তি থাকে তাহলে করপোরেশন সে-কথা বলুক, আমাকে বারণ করুক কাজ শুরু করতে। আমি কি আবহমানকাল অপেক্ষা করে থাকব? আব স্যাংশানিং অথরিটির বক্তব্য: এত এত 'রিভাইজড প্ল্যান' আসছে যে তা দেখে উঠতে, বিচার করে আপত্তি জানাতে সময় লাগবে তো? আমার তো মা দুর্গার মতো দশটা হাত নেই।

আপাতদৃষ্টিতে, দুপক্ষের বক্তব্যের মধ্যেই কিছুটা যুক্তি থাকে।

এটা একটা ট্যাকটিক্স! ঐ রিভাইজড-প্ল্যানটি দাখিল করে প্রমোটার রাতারাতি তলার-পর-তলা গেঁথে যায়। যাদের সেটা রোখার কথা তারা কাঞ্চনমূল্যে চোখ বুঁজে থাকে, অথবা আর্নড-লীভ নিয়ে প্রমোটারের পয়সায় সপরিবারে কলকাতার বাইরে ঘুরে আসতে যায়। ঘটনাচক্রে বাড়িটা ভেঙে না পড়লে এই কলকাতা শহরের অসংখ্য বেআইনি প্রাসাদের একটা সংখ্যাবৃদ্ধি হয় মাত্র। প্রমোটার, ঠিকাদার আর করপোরেশনের অসৎ কর্মচারী নিজের-নিজের বাথরুমে ফল্‌স্‌-সিলিঙ বানাতে মনোনিয়োগ করে।

এক্ষেত্রে ঝামেলা পাকিয়েছে বাড়িটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ায়।

—তোমার কোন দায়িত্ব নেই তো?

—আমার দায়িত্ব কেমন করে থাকবে, অলকা? আমি চারতলা বাড়ির প্ল্যান দাখিল করেছি। তাছাড়াও আমি লিখিতভাবে বিল্ডিং-ডিপার্টমেন্টকে জানিয়ে দিয়েছি যে, আমি ঐ বাড়ি তৈরীর কাজ দেখা-শোনা করছি না। আর্কিটেক্ট হিসাবে সুপারভিশানের দায়িত্ব আমার রইল না। ফলে আমার কী দায়িত্ব?

অলকা জানতে চায়, আচ্ছা কলকাতা শহরের আদিম বাঙালী বাসিন্দারা এই যে জমি-বাড়ি অবাঙালী ধনকুবেরদের বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হচ্ছে, এ জন্য বাস্তবে দায়ী কে?

—দায়ী একটা বিষচক্র, যার মূল নিয়ামক রাজ্য সরকার!

—কেন সরকারের কী ভূমিকা?

—এই ভেঙে-পড়া বাড়ির কেসটাই বিশ্লেষণ করে দেখ:

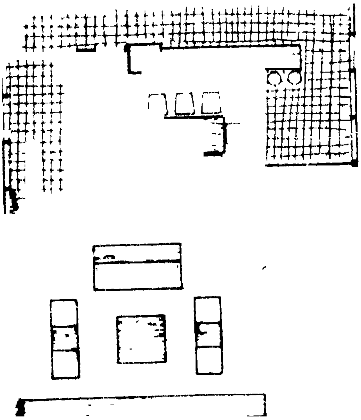

অশোক ঐ বাড়ির কেস-হিস্ট্রিটা সবিস্তারে বোঝাতে থাকে।

বাড়ির মালকিন এক বিধবা বুড়ি। আশির কাছাকাছি বয়েস। একটি উদ্‌বাস্তু নিঃস্ব যুবতী বিধবাকে নিয়ে থাকত ঐ বাড়িতে। দ্বিতল বাড়ি। প্রতিতলায় তিনখানি করে ঘর। দ্বিতলে একটি ঠাকুরঘর। একটি বুড়ির ঘর আর একটি তার পাতানো-নাতনির। একতলায় একটি বাঙালী পরিবার বাড়ির প্রায় গৃহপ্রবেশের কাল থেকে আছেন। বাড়িটি ছোট কিন্তু সংলগ্ন জমি অনেকটা। তাতে কামিনী, কাঞ্চন, পেয়ারা, টগর এমনকি দুটি কলমের আম গাছও আছে। বুড়ির গোপালের প্রতিদিন টাটকা ফুলের অর্ঘ পেতে কোনও অসুবিধা হত না। ভদ্রাসনটি চল্লিশের দশকে নির্মিত। গৃহকর্তা রিটায়ার করে বানিয়েছেন। ম্যাচিয়র্ড ইনশিওর পলিসির টাকায় আর পেনশন কম্যুট করে। গিন্নিকে বলে গিয়েছিলেন, আব তোমাব কোন ভাবনা রইল না, সুরো। দোতলায় হাত-পা মেলে থাকবে। এক তলা থেকে মাসান্তে পঁয়ত্রিশটি রজতমুদ্রা পাবে। পঁয়ত্রিশ টাকায় একা বিধবা-মানুষের সংসার হেসে-খেলে...

বুড়ি—তখনো তিনি বৃদ্ধা নন, আধুলির মাপের টিপপরা নিঃসন্তানা সধবা প্রৌঢ়া—কর্তাব মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিলেন, তোমার মুখের কোন আড় নেই। আজ বিষ্যুৎবার...

তারপর বোধকরি হাজার দুয়েক বিষ্যুৎবার অতিক্রান্ত।

দেশ স্বাধীন হয়েছে। বিধান রায়—প্রফুল্ল সেন—অজয় মুকুজ্যে, সিদ্ধার্থশঙ্কর, শেষমেশ জ্যোতি বোস। চল্লিশ বছরে বিধবার বয়সই শুধু নয়, সব কিছুর মূল্যই চক্রবৃদ্ধিহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। একতলার যুবক-যুবতী ভাড়াটে এতদিনে বুড়ো-বুড়ি। তাদের তিন ছেলেই কৃতি। একজন ডাক্তার, একজন এঞ্জিনিয়ার, অন্যটি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। কেউই এ-বাড়িতে থাকে না। নিজের নিজের অ্যাপার্টমেন্ট-হাউসে চলে গেছে। ভাড়াটে বুড়ো-বুড়ি দুটো বিধবা মেয়ে নিয়ে ঐ পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়াতেই পড়ে আছেন।

এই চল্লিশ বছরে পাঁচ-সাতবার এসেছে কর্পোরেশনের ভ্যালুয়েশান বাড়াবার নোটিস। বুড়ি হিয়ারিঙে উপস্থিত হতে পারেনি। উকিল দিতেও পারেনি। তবে কর্পোরেশনের ইন্সপেক্টর ভদ্রলোক অমানুষ ছিলেন না। বুড়ি-মার হালচাল দেখে তিনি নিজেই অ্যাসেসারকে বলে-কয়ে ভ্যালুয়েশান কমিয়েছেন। তবু কিছু না কিছু না করতে করতেও ট্যাক্সের অঙ্কটা যেখানে দাঁড়িয়েছে তাতে বাড়ি ভাড়ার টাকা কটা কর্পোরেশনের ট্যাক্স দিতেই যায়।

এই যাঁর আর্থিক অবস্থা তিনি সন্দীপ ধনপতিয়ার সাক্ষাতে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। সন্দীপ ওঁকে কথা দিয়েছে, এই বাড়িটা ভেঙে সে একটা চারতলা বাড়ি বানিয়ে দেবে। বুড়িকে এক পয়সাও খরচ দিতে হবে না। বুড়ি থাকবে সবচেয়ে উপরের 'ফেলাটে', যাতে ছাদটা থাকে নিজের এক্তিয়ারে। বুড়ির ৺গোপালের সিংহাসন বসবে চিলেকোঠার ঘরে। এ ছাড়া বুড়ির নামে থাকবে অনেক টাকার—কী জানি, ঠিক কত টাকার—কোম্পানির কাগজ। যা থেকে মাস-মাস বুড়ি তিন শ' টাকা সুদ পাবে। কোথায় পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়া আর কোথায় তিন শ টাকা সুদ! তাছাড়া কর্পোরেশানের ট্যাক্সোও আর দিতে হবে না বুড়ি-মাকে।

পাতানো-নাতনির কোন মাসতুতো ভাই এসে বাগড়া দিয়েছিল, বলেছিল সে আরও ভাল শর্তে জমি-বাড়ি বিক্রি করে দেবে।

বুড়ি শোনেনি।

পাতানো-নাতনিও তার মাসতুতো দাদাকে এ ব্যাপারে নাক-গলাতে বারণ করল যখন বুড়ি তার নাতনির কানে কানে বলল, তোরেই তো এই 'ফেলাট' আর কোম্পানির কাগজ দে-যাব বে। আমার আর কে আছে বল?

এসব খবর অশোক প্রথমটা জানতে পারেনি। জেনেছিল অনেক পরে। সে যখন জমি দেখতে যায় তখন বুড়ি ছিল দ্বিতলের ঘরে। অশোককে জানিয়েছিল, হ্যাঁ, সে চারতলার ফ্ল্যাটেই থাকবে, তবে একটা ঐ কি যেন বলে ....হ্যাঁ 'লিফ্‌টি'র ব্যবস্থা থাকা চাই, যাতে বুড়ি-মা বোতাম টিপে একতলা থেকে চারতলায়, চাই কি ছাদেও যেতে পারে।

অশোক জানতে চেয়েছিল, তা বুড়ি মা, আপনি ঠিক মত বোতাম টিপতে পারবেন তো?

—কেন গো ছেলে? আমি কেন বোতাম টিপতে গেলাম? আমার অ্যাই নাতনি রয়েছে কী করতি?

জোয়ান নাতনি মুখে আচঁল চাপা দিয়ে হাসি লুকিয়েছিল।

অশোক টের পায়নি যে, মেয়েটি পাতানো নাতনি।

তারপর যেমন হয়। বাড়ি ভাঙার প্রয়োজনে ভাড়াটেদের স্থানান্তর করার আয়োজন করা হল। একতলার ভাড়াটিয়া প্রোমোটারের সঙ্গে কী চুক্তি করল জানা নেই। সন্দীপ তাঁকে কত হাজার নগদ দিয়েছে তার খবর অশোক জানে

না। এছাড়া একটা অ্যাপার্টমেন্ট যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট-এর পিতৃদেবকে দিতে হবে এ নিশ্চিত। বুড়ি-মা তার নাতনিকে নিয়ে কাশী গেল।

সেই যে গেল আর ফিরল না।

শোনা যায়, কাশীতে গঙ্গার উপর একটা এক-কামরা ঘর সে পেয়েছে। যাবৎ জীবন শর্তে। বিনা ভাড়ায়। তার উপর মাসান্তে চার-শ টাকা প্রণামী, যাবৎ মণিকর্ণিকাগমন! বুড়ি তো আকাশের চাঁদ পেয়েছে হাতে।

তার ডবকা নাতনিটা? সে নাকি এখন এক গা গয়না পরে। বুড়ির সঙ্গে গঙ্গাযাত্রা করতে তার বয়ে গেছে।

ইতিহাস নাকি নিজের পুনরাবৃত্তি করতে ভালবাসে। পণ্ডিতেরা তাই বলেন। অন্তত কলকাতার আদিম বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে এটা নির্জলা সত্যি। সবাই হয়তো বুড়ি-মার মতো হাতে চাঁদ পায় না। তবে প্রত্যেকেই স্বরাজ্যের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য ত্যাগ করে অ্যাপার্টমেন্টের এক-টেরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

অলকা বলে, তা এতে প্রাদেশিক সরকারের কী দোষ দেখলে?

—বিধান রায় থেকে জ্যোতি বোস কোনও মুখ্যমন্ত্রীরই মনে হল না মান্ধাতার বাবার আমলের ঐ 'ওয়েস্ট বেঙ্গল রেন্ট কন্ট্রোল অ্যাক্ট'টা যুগোপযোগী হয়। এটারও পরিবর্তন দরকার। বিধানসভায় একটা বিল আনা উচিত। যাতে ঐ বুড়িমার মতো বাড়িওয়ালাদের প্রতি প্রাদেশিক সরকার কিছু সুবিচার করতে পারে। ভারতবর্ষের অন্য কোনও প্রদেশে এমন আজব 'একুশে আইন' নেই।

—কিন্তু তুমি-আমি যেটা বুঝছি সরকার সেটা বুঝতে পারেন না কেন?

—বুঝতে পারেন না, তা তো বলিনি আমি। জেনে-বুঝে স্বজ্ঞানে তাঁরা এই অন্যায়টা মেনে নিয়েছেন। মেনে নিচ্ছেন! নিজেরা অন্যায় করছেন।

—কিন্তু কেন?

—বলছি, তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো? রাজীব গান্ধী তো একজন অত্যন্ত আধুনিক মনোভাবাপন্ন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন! তাহলে তিনি 'শাহ্ বানু কেসটা'তে মুসলমান হতভাগিনী ভগিনীদের পক্ষে দাঁড়াতে পারলেন না কেন? তিনি জানতেন, ভারতবর্ষ একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। পাকিস্তান বা ইরাণের মতো মুস্লিম রাষ্ট্র নয়। তাহলে এখানে কেন ঐ আইনটা আজও বলবৎ থাকবে, যার বলে বলীয়ান হয়ে একজন মুসলমান প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাঁর বিশ বছরের বিবাহিত বিবিকে পুত্র-কন্যাসহ বিনা খোরপোশে পথে বার করে দিতে পারবেন। 'তালাক-তালাক-তালাক' বলে?

—সেটাই বা কেন?

—একই হেতু। বাড়িওয়ালার চেয়ে ভাড়াটিয়ারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কলকাতায় যত লক্ষ বাড়িওয়ালা ভোটার তার পাঁচ গুণ ভাড়াটে ভোটার। তেমনি মুসলমান নারীসমাজ অনুন্নত, তারা ভোট দিতে আসে না। নারী ভোটারদের চেয়ে মুসলমান

পুরুষ ভোটার সংখ্যাগরিষ্ঠ। 'ওরে ভাই কার নিন্দা কর তুমি? মাথা কর নত। এ আমার এ তোমার পাপ'।

মিঠুন পিঠে ব্যাগ নিয়ে এসে দাঁড়ায়।

অশোক উঠে পড়ে। বলে,অলকা, টেলিফোন করে দেখ তো সোমার মা কী বললেন?

অলকা ফোন কবল।

সোমাদের বাড়িতে যে মেয়েটি সোমার মাকে রান্নাবান্নায় সাহায্য করে সে জানালো যে , তার মা দিদিকে নিয়ে স্কুলে রওনা হয়ে গেছেন। সোমার মা নাকি ইতিপূর্বে মালতিকে বার কতক ফোনের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু প্রতিবারই 'এনগেজড-টোন' হয়ে যায়। সোমার মায়ের এই কম্বাইন্ড-হ্যান্ডটি বেশ চলতা-পুরজা। এনগেজড-টোন রিঙিং টোন-এর ফারাক বোঝে।

অশোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'দোষী জানিল না কী দোষ তাহার, বিচার হইয়া গেল.....'

—তার মানে?

—দেখছ না, সমাজে আমার ধোপা-নাপিত বন্ধ!

অশোক গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করল। মিঠুনকে নিয়ে রওনা দিল।

কাজের ঠিকে-ঝি এসে রাত্রের এঁটো বাসন সাফা করতে বসল। অলকা সাত-সকালেই স্নান সেরে নেয়। কী শীত, কী গ্রীষ্ম। শায়া, ব্লাউজ গুছিয়ে, চাবির গোছাটা ট্যাঁকে গুঁজে বাথরুমের দিকে রওনা দিতে যাবে, আবার বেজে উঠল টেলিফোন।

সকাল সাতটার মধ্যে তৃতীয়বার।

বাঁ-হাতে শাড়ি-ব্লাউজের গোছা, ডান হাতে যন্ত্রটা তুলে নিয়ে বললে, হ্যালো?

—ইজ দ্যাট সেভেন-ফাইভ এইট-ফোর-সিক্স-ফোর?

—ইয়েস, ইয়েস, কাকে চাইছেন?

—আমি বাসু। পি.কে.বাসু, চিনতে পারলে তো অলকা?

অলকা শশব্যস্তে বাঁ-হাতের বান্ডিলটা পাশের টেবিলে নামিয়ে রেখে দু-হাতে ফোনের রিসিভারটা বাগিয়ে ধরে। বলে, বাঃ! চিনতে কেন পরব না, মেসোমশাই? কেমন আছেন বলুন? মাসিমা এখন....

—আমরা কেমন আছি জানতে হলে ফোনটা তোমার দিক থেকে ইনিশিয়েট হবার কথা। তা যখন হয়নি তখন ওসব খেজুরে আলাপ থাক। যা জিজ্ঞেস করছি, তার ঠিক-ঠিক জবাব দাও দিকি। সংক্ষেপে, টু দ্য পয়েন্ট! আই মীন, 'ফালতু বাত' একদম এড়িয়ে, ঠিক যেটুকু জানতে চাইছি....

পি.কে.বাসু একজন নামকরা ব্যারিস্টার। শুধু কোর্টকাছারি এলাকাতেই নয়, তার বাইরেও তাঁর সুনাম। পি.কে. বাসুর ধর্মপত্নী রানু বাসু সম্পর্কে অলকার

মাসিমা হন, ওর মায়ের মাসতুতো বোন। বাসু-সাহেব ইতিপূর্বে নিজে থেকে কখনো এ বাড়িতে টেলিফোন করেছেন বলে অলকার মনে পড়ে না। দহরম-মহরম বা যাতায়াত কিছু নেই! তবে বিজয়ার পর অলকা প্রতি বছর মাসিমাকে একটা করে প্রণামী চিঠি পাঠায়। সেই চিঠিতেই মাসিকে লেখে 'মেসোকেও আমার শতকোটি প্রণাম জানাবেন।' এই পর্যন্ত।

বলে, বলুন মেসোমশাই ?

—অশোক এখন কোথায় আছে তা কি তুমি জান ?

—কেন জানব না ? এইমাত্র ও তো মিঠুনকে নিয়ে স্কুলে পৌঁছে দিতে গেল !

—ডিড আই আস্ক য়ু দ্যাট ?

—আজ্ঞে ? তাই তো জানতে চাইলেন আপনি। ও কোথায় গেছে...

—না, অলকা। আমি জানতে চেয়েছিলাম, অশোক এখন কোথায় আছে তা তুমি জান, কি জান না। তোমার সামনে তিনটে 'অল্টারনেটিভ আনসার' ছিল। 'আমি জানি', 'আমি জানি না', অথবা হেরম্ব মৈত্রের মতো 'আমি জানি, কিন্তু বলব না।' বাজে কথা বলছ কেন ?

অলকা অপ্রস্তুতের এক শেষ!

বাসু-সাহেব বলেন, আমার অনুমান আধঘণ্টার মধ্যেই তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে। দেখা হওয়া মাত্র তাকে বল যে,আমি আজ সারাদিন বাড়িতে আছি। সে যদি প্রয়োজন বোধ করে তাহলে আমাকে বাড়িতে ফোন করতে পারে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এ তো সহজ কথা। ওকে বলব আপনাকে ফোন করতে।

—ডিড আই টেল য়ু দ্যাট ?

—আজ্ঞে তাই তো বললেন আপনি। ও ফিরে এলে যেন আপনাকে ফোন করে।

—না অলকা, তা আমি বলিনি। বলেছি, সে যদি প্রয়োজন বোধ করে...

—ও আচ্ছা, আচ্ছা। যদি সে প্রয়োজন বোধ করে।

—ইয়েস! এইবার তোমার প্রথম প্রশ্নটার জবাব দিই। তোমার মাসিমা ভাল আছেন। আমার একটু সর্দিজ্বর মতো হয়েছে। সেজন্য বাড়িতেই থাকব সারাদিন। তোমরা যদি প্রয়োজন বোধ কর, অথবা টেলিফোনে যোগাযোগ করা যদি বাঞ্ছনীয় বা সম্ভবপর না হয়, তাহলে সরাসরি আমার বাড়িতে চলে আসতে পার। বুঝলে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝলাম। এ তো সহজ কথা। কিন্তু প্রয়োজনটা কী জাতের হতে পারে, মেসো ?

—আন্দাজ করতে পারছ না ? আজ সকাল থেকে 'আন্‌এক্সপেক্টেড' কোন কিছু ঘটেনি ?

—তা ঘটেছে। প্রথমত......

—নো। নট ওভার দ্য টেলিফোন। ও কি 'এ.বি.-র' জন্য দরখাস্ত করেছে?

—'এ.বি.'! 'এ.বি.' মানে কী?

—আই রিপীট: টেলিফোনে এসব আলোচনা করা ঠিক নয়। বরং অশোক ফিরে এলেই তোমরা দুজন আমার বাড়িতে চলে এস। ফোন-টোন করার দরকার নেই। ফাইলপত্রের জন্য যেন দেরি না করে....

হঠাৎ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে অলকা। বলে, ওর কি কোন বিপদ হয়েছে?

—ডোন্ট বি প্যানিকী! বাড়ি বন্ধ করে চলে এস। তোমার ছেলের ছুটি হবার আগেই ফিরে যেতে পারবে।

টেলিফোনটা নামিয়ে রাখেন বাসু-সাহেব।

অলকা রীতিমতো বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

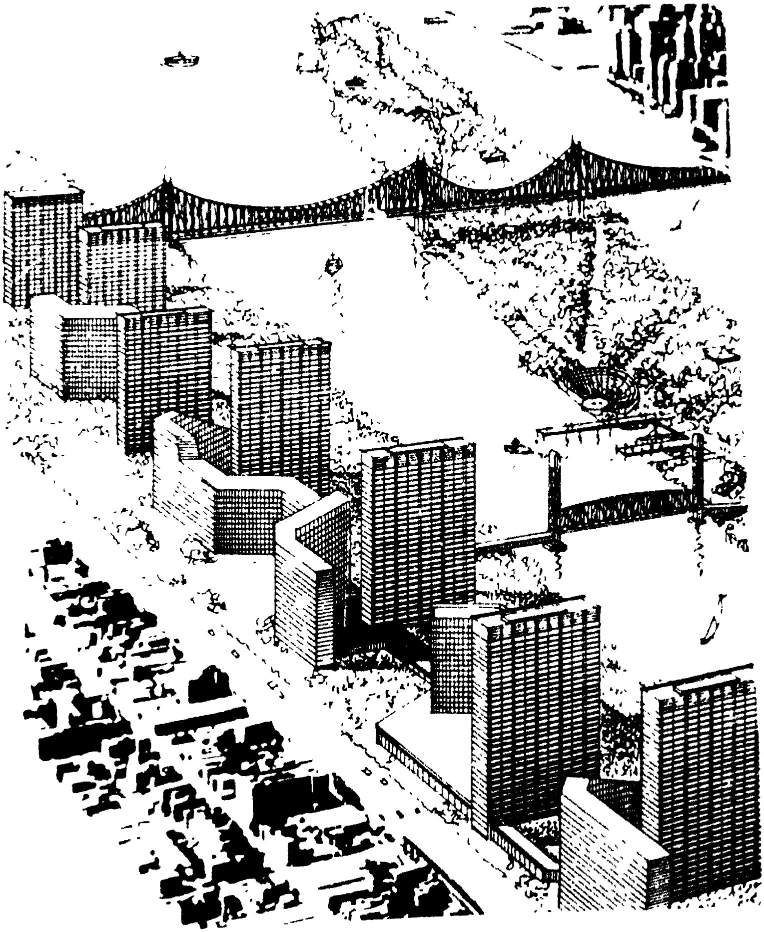

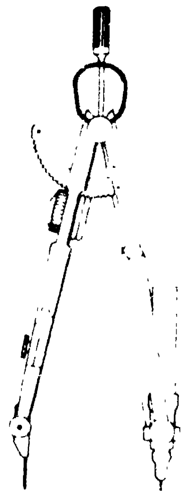

স্কুলের সামনে গাড়ির পর গাড়ি। বাচ্চারা নেমে যাচ্ছে। দারোয়ান পথনির্দেশ দিয়ে গাড়িগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বড়লোকের পাড়া, বড়ঘরের ছেলে-মেয়েদের স্কুল। অধিকাংশই বাড়ির গাড়িতে আসে। অশোক যে ফিয়াট গাড়িটার পিছনে নিজের গাড়িটা পার্ক করল সেটার নম্বর ওর পরিচিত। সিতাংশু চৌধুরীর গাড়ি। ড্রাইভারের পাশের সীটে বসেছিল দীপু। নেমেই এদিকে ফেবে। মিঠুনের সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে যায়। মিঠুন ওর দিকে অগ্রসর হবার উপক্রম করতেই দীপু একছুটে— কী জানি কেন— স্কুলবাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল। দারোয়ান সিগনাল দিল ফিয়াট গাড়িটাকে রওনা হবার জন্য। কিন্তু সিতাংশু শুনল না। নেমে এল গাড়ি থেকে। এগিয়ে এল অশোকের দিকে। ততক্ষণে মিঠুনও এগিয়ে গেছে স্কুলের দিকে। সিতাংশু একটা হাত রাখল অশোকের কাঁধে।

অশোক বসেছিল স্টিয়ারিঙেব সামনে। হেসে বললে, কী ব্যাপার? আজ টাইম-টেব্ল্ পালটে দিলি যে?

সিতাংশু ঝুঁকে পড়ে বললে, আজ একটা বিশেষ দিন নয়? একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়নি রাতারাতি? মালতীর মতো তুইও কি তা অস্বীকার করবি?

অশোকের মেজাজ খারাপ হয়ে যায় হঠাৎ। বলে, ঝেড়ে কাশ্ তো সিতু! কী দুর্ঘটনা ঘটে গেছে রাতারাতি? তোর না আমার?

—আজকের কাগজে দেখিস নি? একটা সাততলা বাড়ি...

—তাতে তোর-আমার কী?

—আমার কিছু নয়, কিন্তু তোর? আর য়ু নট্ অ্যাফেক্টেড?

—বিন্দুমাত্র নয়! তাতে আমি জড়িয়ে পড়তে যাব কেন?

—কাগজ দেখেছিস্?

—আজকের কাগজ? দেখেছি। কেন?

—কী কাগজ ?

—'আজকাল'।

দারোয়ান এগিয়ে আসে। সিতাংশুকে বলে, সা'ব! মেহেরবানি করকে...

এতক্ষণে ওদের দুজনের খেয়াল হয়, পিছনে পরপর অনেকগুলি গাড়ি এসে জট পাকানোর উপক্রম করছে! সমবেত হর্ন বাজছে। নাগরিক শব্দ-দূষণে এতই অভ্যস্ত যে, দুজন তা খেয়াল করছে না।

সিতাংশু বলে, ফেরার পথে একটা 'সঞ্জয় উবাচ' কিনে নিয়ে যাস্। যদি প্রয়োজন বুঝিস তাহলে ফোন করিস আমাকে।

একছুটে গিয়ে বসে স্টিয়ারিঙে। স্টার্ট দেয় তৎক্ষণাৎ।

ফিয়াট গাড়িটা ফাঁক-ফোকরের মধ্যে দিয়ে উধাও হয়ে যায়।

অশোকও গাড়িতে স্টার্ট দেয়। সোজাসুজি বাড়ি যাবে না। একটু এগিয়ে সামনের কেমিস্ট-এর দোকানের পাশে একটা হকার-স্টল আছে। সকালবেলা লোকটা খবরের কাগজ বেচতে বসে। তার কাছ থেকে এককপি 'সঞ্জয় উবাচ' কিনে নিয়ে যেতে হবে। সে-কাগজে নিশ্চয় কিছু বার হয়েছে ওর নামে।

*　　　*　　　*

গাড়িটাকে কার্ব ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে নেমে আসে। তার বগলে একটা সদ্য-ক্রীত 'সঞ্জয় উবাচ'। শহরের সবচেয়ে বিখ্যাত, সবচেয়ে বেশি বিক্রিত বাংলা দৈনিক। কলবেল বাজাতে অলকা ম্যাজিক-আইতে দেখে নিয়ে সদর খুলে দিল। অশোক নিজে থেকে বললে, আজকের কাগজে আমার নামে নিশ্চয় কোন খবর আছে। 'সঞ্জয় উবাচ'তে। সবার আগে সেটা খুঁজে দেখি।

অলকা বলে, মনে থাকতে থাকতে বলে রাখি, বাসু-মেসো ফোন করেছিলেন—পি.কে. বাসু-মেসো।

—হঠাৎ ?

—বললেন উনি সারাদিনই বাড়িতে আছেন, তুমি ওঁকে একবার ফোন কর...না না, 'যদি প্রয়োজন বোধ কর' তবে তাঁকে বাড়িতে ফোন করতে পার। তাঁর সর্দিজ্বর হয়েছে, সারাদিন বাড়িতে থাকবেন।

—'প্রয়োজন' বোধ করি ? কিসের প্রয়োজন ?

— তুমি কি ইতিমধ্যে 'এ.বি' করিয়েছ ?

—'এ.বি' ! তার মানে ?

—টেলিফোনে ওসব কথা বলতে নেই। অলকা যেন 'টেপ-রেকর্ডার' !

—টেলিফোনে ! আমরা কি টেলিফোনে কথা বলছি ?

—সরো, আমার কাজ আছে।

ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে অলকা ড্রেসিং টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়।

অশোক আপন মনে একটা স্বগতোক্তি করে : আজ দেখ্‌ছি সবাই মিস্টিরিয়াস!

টেবিলে কাগজটা বিছিয়ে সে পড়তে থাকে।

ঐ বিশেষ খবরটাই। সন্দীপ ধনপতিয়ার ভেঙেপড়া সাতমহলা বাড়ি। প্রথম পৃষ্ঠাতে এখানে একটি ছবিও ছাপা হয়েছে।

ঘরের ভিতর থেকে অলকা বলে, কাগজ পরে পড়। চল, নিউ আলিপুর থেকে ঘুরে আসি। মেসো কী একটা কথা বলতে চান...

এসব কথা অশোকের কানেই ঢোকে না। সে আপন মনে চাপা আর্তনাদ করে ওঠে, গুড হেভেন্স! এসব কী লিখেছে আমার নামে!

—কী?—অসমাপ্ত বেশবাস নিয়েই অলকা বের হয়ে আসে। অশোক তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে কাগজের একটি বিশেষ অংশে।

'আজকাল' পত্রিকায় বলা হয়েছে যে, ভেঙে-পড়া বাড়িব ঠিকাদারকে পুলিসে গ্রেপ্তার করেছে; কিন্তু মালিক আর স্থপতিবিদকে পুলিস ধরতে পারেনি। তারা পলাতক। সেখানে আর্কিটেক্টের নামটা জানানো হয়নি। কিন্তু এখানে, 'সঞ্জয় উবাচ' পত্রিকাব নিজস্ব সংবাদদাতা শচীন দাশশর্মা সেটুকু উহ্য রাখেননি। জানিয়েছেন, সন্দীপ ধনপতিয়ার ভেঙে-পড়া বাড়ির ডিজাইনাব 'মুখার্জী অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস্ কোম্পানি'। পুলিস ঐ প্রতিষ্ঠানেব মালিক অশোক মুখার্জীর বাড়িতে হানা দেয়; কিন্তু তার পূর্বেই ঐ আর্কিটেক্ট ভদ্রলোক আত্মগোপন করেছেন।

—এসব কী লিখছে পাগলের মতো? অলকা জানতে চায়।

—আমি মানহানির মামলা আনব! কী ভেবেছে এরা?

অলকা বলে, কিন্তু সংবাদদাতা তো তোমাকে চেনে না, জানে না, তোমার সঙ্গে তার কোনও শত্রুতাও তো নেই। তাহলে অহেতুক এসব কথা কেন লিখবে তোমার নামে? আর তোমার নাম-ঠিকানাই বা সে জানল কী করে?

—বুঝলে না? অ্যাক্‌সিডেন্ট হয়েছে রাত নয়টায়। খবরটা ছাপা হয়েছে মধ্যরাত্রে। অতটুকু সময়ে ঐ নিজস্ব সংবাদদাতা যেটুকু টেলিফোনে জানতে পেরেছে তাই 'নিউজ-আইটেম' হিসাবে দাখিল করেছে। হয়তো ক্যালকাটা কর্পোরেশনে তার কোনও লিঙ্ক-ম্যান আছে। তাকে টেলিফোন করেছে। সে জানিয়েছে আর্কিটেক্ট ফার্ম-এর নাম মুখার্জী অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস্। আমার নাম-ঠিকানাও বলেছে। সে পার্টলি রাইট। প্রাথমিক নক্‌শা তো আমিই দাখিল করেছি, অর্থাৎ চারতলা বাড়ির। তারপর যে অন্য কোনও লাইসেন্সড-আর্কিটেক্টকে দিয়ে ধনপতিয়া রিভাইজড প্ল্যান-ডিজাইন দাখিল করেছে এ খবর হয়তো সে অত কম সময়ে সংগ্রহ করতে পারেনি। হয়তো ওদিকে পুলিস ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে আর্কিটেক্ট-এর বাড়ি রেইড করা হয়েছে, আর সে লোকটা 'ভাগলবা'। ততক্ষণে হয়তো রাত দশটা-এগারোটা। নিজস্ব সংবাদদাতা মহাশয়ের ফোর্থ পেগ্-এর পাত্রটাও নিঃশেষ

হয়েছে। তিনি নিজ বুদ্ধিমতো দুই-আর দুয়ে চার করে নিউজ-এডিটারের টেবিলে হাতে-গরম রিপোর্টটি দাখিল করে বাড়ি ফিরেছেন।

অলকা বলে, এখন বোঝা যাচ্ছে মালতী কেন অমন আমতা-আমতা করছিল, আর কেনই বা সিতাংশুবাবু নিজে থেকে...

—দ্যাটস্ ইট! আর রামশরণজীর ব্যাপারটা বুঝেছ? আকবর বাদ্‌শার কিস্‌সাটা?

—না। সেটা কী?

—'আকবরনে লিখা হ্যয়' বলেনি রামশরণ। আমি ভুল শুনেছি। ও বলতে চেয়েছিল: 'অখ্‌বরমে লিখা হ্যায়'। 'অখ্‌বর' মানে খবরের কাগজ, সংবাদপত্র। রাতারাতি ঐ 'নিজস্ব সংবাদদাতা' আমার কী সর্বনাশ করে বসল! চল, আমরা বাসু-মেসোর কাছে যাব। এখনই! হেভি ড্যামেজ সু করব! তৈরী হয়ে নাও।

—আমি মোটামুটি তৈরিই। আচ্ছা, বাসু-মেসো ওটা কী বলতে চেয়েছিলেন তা বুঝতে পেরেছ? 'এ.বি'?

—এখন তো সেটা জলের মতো পরিষ্কার। উনি ধরে নিয়েছেন, কাগজে যা ছাপা হয়েছে তাই সত্য। সেটা ধরে নেওয়াই স্বাভাবিক। অর্থাৎ ভোর রাত্রে আমাদের বাড়ি পুলিসে রেইড করেছে; কিন্তু আমি কেটে পড়েছি তার আগেই। সেজন্যই উনি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেননি 'অশোক কোথায়?' বরং প্রশ্ন করেছিলেন, 'অশোক বর্তমানে কোথায় তা কি তুমি জান?'

—সে তো বুঝলাম। কিন্তু ঐ 'এ.বি' মানে কী?

—'অ্যান্টিসিপেটারি বেইল।' উনি ধরে নিয়েছেন আমি আত্মগোপন করে আছি। 'অ্যান্টিসিপেটারি বেইল'-এর ব্যবস্থা হয়ে গেলে আবার লোক-সমাজে ফিরে আসব। কী কাণ্ড!

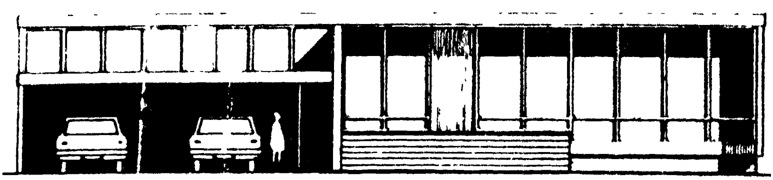

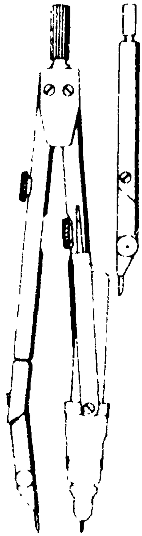

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরের কথা। অশোক আর অলকা বসেছে বাসু-সাহেবের ভিজিটার্স চেয়ারে। নিউ আলিপুরে ওঁর বাড়িতে। রানীমাসিমা এতক্ষণ ছিলেন। অশোক যখন প্রাথমিক এজাহার দিচ্ছিল। ওর কোনও বিপদ নেই, সবটাই ভুল বোঝাবুঝি— এটুকু বুঝতে পেরে নিশ্চিন্ত মনে তিনি নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন। হুইল চেয়ারে পাক মেরে পাক-ঘরের দিকে গেছেন। সুজাতার সাহায্যে কিছু প্রাতঃরাশ সাজিয়ে এঘরে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে।

বাসু বলেন, তুমি যা বললে আমার মনে হয় তাই ঘটেছে। কিন্তু তোমার বাড়িতে ফোন আছে— 'মুখার্জী অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস' এন্ট্রিতে। ঐ নিজস্ব সংবাদদাতার উচিত ছিল তোমার নামটা লেখার আগে তোমাকে একটা টেলিফোন করা। সেটা না করা তার পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ হয়েছে। আমি আটখানা কাগজ কিনেছি আজ। চারটে বাংলা, তিনটে ইংরেজি, একটা হিন্দি। সাতখানা কাগজে আর্কিটেক্ট-এর নাম উল্লেখ করা হয়নি। এ লোকটা, শচীন দাশশর্মা, আগবাড়িয়ে নামটা লিখতে গেল যখন তখন তার উচিত ছিল ঠিক মতো সন্ধান নিয়ে দেখা। না জেনে একজন আর্কিটেক্টকে ডিফেম করাটা ঠিক প্রফেশনাল কাজ হয়নি।

— এখন আপনি আমাকে কী করতে বলেন ?

— দ্যাটস্ দ্য মিলিয়ান ডলার কোশ্চেন !

— তার মানে ?

— তুমি যা বলছ তা সত্যি হলে তোমার তরফে একটা প্রাইমা-ফেসি লাইবেল কেস হয়। অর্থাৎ এ সংবাদ তোমার পক্ষে মানহানিকর বলে ধরা যেতে পারে।

— তার মানে আমি ঐ সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনতে পারি ?

— অত তাড়াহুড়ো কর না, অশোক। তার আগে তোমাকে একটা প্রতিবাদ করতে হবে, যে লোকটা বা যে প্রতিষ্ঠান তোমার মানহানি করেছে বলে তোমার ধারণা হয়েছে তাকে বা তাদের ত্রুটি সংশোধনের একটা সুযোগ তোমাকে দিতে

হবে। সৌজন্যের তাই নির্দেশ। মেনে নেওয়া : টু এর ইজ হিউম্যান।

— সেটা কী ভাবে হতে পারে ?

— সহজেই। তুমি সম্পাদককে চিঠি লিখে জানাতে পার যে, ঐ ভেঙে-পড়া বাড়িটা তোমার ডিজাইনে তৈরী হচ্ছিল না, তুমি মাত্র চারতলা বাড়ির প্ল্যান দাখিল করেছিলে। তারপর তোমার অজ্ঞাতসারে বাড়ির মালিক সন্দীপ ধনপতিয়া অন্য একজন লাইসেন্সড আর্কিটেক্টকে দিয়ে... বাই দ্য ওয়ে, তার নাম কী ?

— তা আমি জানি না।

— কিন্তু রিভাইজড প্ল্যান সাবমিট করা হয়েছিল বলে তুমি নিশ্চিতভাবে জান ?

— আজ্ঞে না, নিশ্চিতভাবে নয়। হেয়ার-সে। আমি শুনেছি যে সন্দীপ ধনপতিয়া আমার প্ল্যান-ডিজাইনটা উইথড্র করে একটা রিভাইজড স্কীম দাখিল করে। সেটা আটতলা বাড়িব। সেটা ঐ গলিতে ঐ প্লটে অনুমোদনযোগ্য নয়, এফ. এ. আর.-এ বাধে—

— এফ. এ. আর. কী ?

— ফ্লোর এরিয়া রেশিও।

— আই সি। তারপর ?

— আমার ইনফর্মেশন : সেই রিভাইজড্ প্ল্যানটি স্যাংশনড হয়নি ; হওয়ার কথাও নয়। কিন্তু কিছু অর্থের বিনিময়ে বিনা বাধায় ধনপতিয়া বাড়িটা বানিয়ে যাচ্ছিল, সুপারভাইজার আপত্তি করেনি, চোখ বুঁজে ছিল। তারপর সেদিন...

— কিন্তু তা কী করে সম্ভব ? রিভাইজড প্ল্যান স্যাংশন না হলে বাড়ির কাজ শুরু হয় কী করে ?

— হয়, মেসো। কলকাতা শহরে সব কিছুই সম্ভব। মহাজাতি সদনের পাশে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুর উপর চৌদ্দতলা বাড়ি ভেঙে ফেলা নিয়ে একটা মামলা সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিল তা আপনার মনে আছে নিশ্চয়। সে-ক্ষেত্রে স্যাংশন্ড প্ল্যানটা ছিল মাত্র পাঁচতলার। বাড়িওয়ালা সেন্ট্র্যাল অ্যাভিন্যুর উপর বাকি নয় তলা বিনা বাধায় বানিয়ে যেতে পেরেছিল। জলের কানেকশান, ইলেকট্রিক বা টেলিফোন কানেকশান, লিফটের স্যাংশন সব কিছুই পেয়েছিল ঐ বেআইনী বাড়িতে। খরচ করতে রাজি থাকলে কলকাতায় কিছুই অসম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রেও নিশ্চয় চারতলার প্ল্যানে ও আটতলা পর্যন্ত...

— কিন্তু এসব কথা কি তুমি প্রত্যক্ষজ্ঞানে জান ?

— আজ্ঞে না।

— তাহলে ওসব প্রসঙ্গে তোমার না যাওয়াই ভালো। তুমি শুধু সম্পাদককে লিখবে....

এতক্ষণে অলকা কথা বলে ওঠে। বাধা দিয়ে বলে, চিঠিটা তো আপনিই লিখতে পারেন মেসো, আপনার মক্কেলের তরফে ?

— হ্যাঁ তাও লেখা যায়।

অশোক বলে, আমার চিঠিকে ওর পাত্তা নাও দিতে পারে, কিন্তু আপনার ঐ 'হোয়্যার‍্যাজ'-মার্কা প্লীডার্স নোটিসে...

বাসু-সাহেব বাধা দিয়ে বলেন, ওটা তোমাদের ভুল ধারণা অশোক: 'সঞ্জয় উবাচ' কোটি কোটি টাকার বিজনেস করে। তাদের মাইনে করা লীগ্যাল অ্যাডভাইজার আছেন। মামলা লড়া এবং মামলা পরিচালনা করাই তাঁদের কাজ। প্লীডার্স নোটিসে 'সঞ্জয় উবাচ' ঘাবড়াবে না। তবে ঐ পত্রিকার সঙ্গে যখন তোমার কোনও শত্রুতাব সম্পর্ক নেই, তখন এই জেনুইন মিস্টেকটা ওরা মেনে নেবে বলেই আমার মনে হয়। ওদের একটা সুযোগ দেওয়া উচিত। দেখা যাক।

তাই করা হল। মক্কেলের তরফে ব্যারিস্টার সাহেব সম্পাদককে জানালেন যে ঐ বিশেষ তারিখের 'সঞ্জয় উবাচ' পত্রিকাব প্রথম ও তৃতীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংবাদে একটি মারাত্মক ভুল তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। সন্দীপ ধনপতিযার যে নির্মীয়মাণ প্রাসাদটি ভেঙে পড়েছে তার আর্কিটেক্ট হিসাবে পত্রিকাতে জানানো হয়েছে মুখার্জী অ্যান্ড অ্যাসোসিযেটস্-এব নাম। অথচ ঐ ভেঙে-পড়া সাততলা বাড়ির আর্কিটেক্ট ঐ প্রতিষ্ঠানটি নয। সংবাদপত্রে আবও প্রকাশিত হযেছে যে, ঘটনার দিন মধ্যরাত্রে মুখার্জী অ্যান্ড অ্যাসোসিযেটস্ কোম্পানিব স্বত্বাধিকাবী শ্রীঅশোক মুখার্জীর যোধপুব পার্ক আবাসে পুলিসে হানা দেয, কিন্তু তাঁকে গ্রেপ্তার কবতে পাবে না, যেহেতু শ্রীমুখার্জী তৎপূর্বেই আত্মগোপন কবেছিলেন। এ সংবাদ আদ্যন্ত ভ্রান্ত। শ্রীমুখার্জীব বাড়িতে পুলিস আদৌ হানা দেযনি, তাঁকে পুলিসে আদৌ খুঁজছে না, কাবণ তিনি ঐ বাড়ির আর্কিটেক্টই নন। এ জাতীয় ভ্রান্ত সংবাদ পবিবেশন কবায দবখাস্তকারীব মক্কেল শ্রীঅশোক মুখার্জী নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। ব্যবসায়িক, আর্থিক এবং সামাজিক ভাবে। সুতরাং ত্রুটি স্বীকাব কবে ভ্রমসংশোধনের কাজটি অবিলম্বে না কবা হলে পত্র লেখক আইনত যা তাই করতে বাধ্য হবেন।

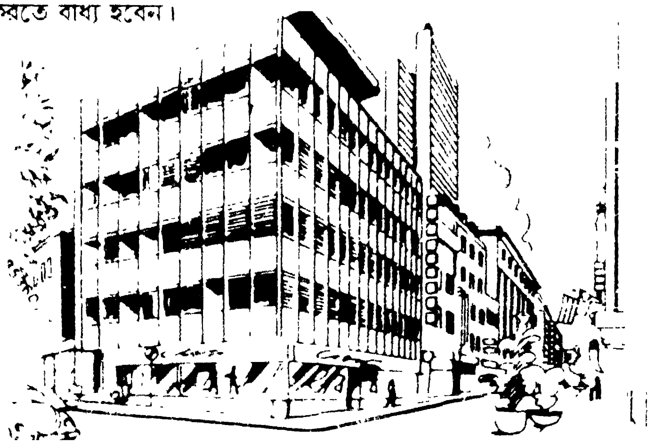

'সঞ্জয় উবাচ' একটি অত্যন্ত প্রতিষ্ঠাবান অতি বিখ্যাত পত্রিকা। ঐ হাউস থেকে তিনটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়— বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দীতে। এছাড়া তিন-চারখানি সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রিকা। সে অফিসের সম্পাদক দপ্তর অত্যন্ত সজাগ, অত্যন্ত কর্মদক্ষ। মাত্র সাতদিনের ভিতরেই বাসু-সাহেবের ওকালতি ভাষায় লেখা চিঠির জবাব চলে এল। পত্রিকার তরফে কোনও লীগ্যাল অ্যাডভাইসারের চিঠি নয়। সম্পাদকের তরফে তাঁর একান্ত-সচিব জবাব দিয়েছেন। সে পত্রের ছত্রে ছত্রে সবিনয় দাম্ভিকতা। কিন্তু আদ্যন্ত আইন বাঁচিয়ে। বলা হয়েছে, প্রকাশিত সংবাদে বাসু-সাহেবের মক্কেল দুঃখিত হয়েছেন জেনে 'সঞ্জয় উবাচ' সম্পাদকীয় দপ্তর মর্মাহত। যাহোক ঐ পত্রপ্রাপ্তির পর তদন্ত করে দেখা হয়েছে যে, কর্পোরেশন রেকর্ড মোতাবেক সন্দীপ ধনপতিয়ার যে বাড়িটি ভেঙে পড়েছে তার নকশা এবং ডিজাইন প্রস্তুত করেছিলেন 'মেসার্স মুখার্জী অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস্' সংস্থা। অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান নয়। যাহোক এ বিষয়ে বাসু-সাহেবের মক্কেল ইচ্ছা করলে লেটার্স টু দ্য এডিটার বিভাগে একটি পত্র পাঠাতে পারেন। উপযুক্ত এবং বাঞ্ছনীয় মনে করলে সেই প্রতিবাদপত্রটি প্রকাশিত হবে। বলা বাহুল্য, প্রয়োজনবোধে সম্পাদকীয় সংশোধন করা হতে পারে।

অশোক সে চিঠি পড়ে বললে, তার মানে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' ভঙ্গিতে? না কি?

বাসু-সাহেব বলেন, সেটা তো এ চিঠি পড়েই বোঝা যায়। সন্দীপ ধনপতিয়ার তরফে তুমি একটি বাড়ির প্ল্যান-ডিজাইন দাখিল করেছিলে--- দ্যাটস এ ফ্যাক্ট। সেটা চারতলা বাড়ি, কি চল্লিশতলা বাড়ি সে প্রশ্ন ওদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বাহুল্য। তার পরিবর্তে কোনও রিভাইজড-প্ল্যান দাখিল করা হয়েছিল কিনা— সে প্রশ্নটাও বাহুল্য। কিন্তু দু-নম্বর ফ্যাক্ট হচ্ছে, কোনও রিভাইজড-প্ল্যান স্যাংশন করা হয়নি। দেয়ারফোর, 'সঞ্জয় উবাচ' পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতার মতে ভেঙে-পড়া বাড়ির আর্কিটেক্ট তুমি।

—আর আমি যে বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টে রেজিস্ট্রি চিঠি দিয়ে জানালাম যে, আমি সুপারভাইড করছি না ?

— সো হোয়াট ? 'সঞ্জয় উবাচ' তো বলেনি যে, তুমি দাঁড়িয়ে থেকে ওটা বানাচ্ছিলে। বা ঐ জাতীয় চিঠি লেখনি।

— আর আমার বাড়িতে পুলিসের হাঙ্গামা ? আমি গ্রেপ্তার এড়াতে পালিয়ে বেড়াচ্ছি ?

— দেখ অশোক, ওরা যদি না চায় তাহলে তোমার প্রতিবাদপত্রটা এমনভাবে এডিট করে ছাপবে যে, মনে হবে তুমি ইতিমধ্যে পুলিসের সঙ্গে ব্যবস্থা করে নিয়েছ! সচরাচর কোন বড় পত্রিকা স্বীকার করতে চায় না যে, তার নিজস্ব সংবাদদাতা পরিবেশিত তথ্যটা ভ্রান্ত!

— তাহলে আপনি আমাকে কী করতে বলেন ? ময়দানে একটা তাঁবু আছে দেখেছি, 'প্রেস ক্লাব' লেখা। সেখানে দেখা করলে কোনও সুরাহা হতে পারে ?

— বর্তমান অবস্থা ঠিক জানি না, ক'বছর আগেও ঐ প্রেস ক্লাবের কর্মকর্তাদের সিংহভাগ ছিল 'সঞ্চয় উবাচ' হৌসের। তাই আমি এ বিষয়ে তোমাকে ঠিক বলতে পারব না। আমার মনে হয় তাঁরাও তোমাকে পরামর্শ দেবেন সম্পাদকের সাজেশান মোতাবেক একটা লেটার্স টু দ্য এডিটর লিখতে।

— তার মানে মানহানির মকদ্দমা করা ছাড়া আমার আর কোনও বিকল্প রাস্তা নেই। এটাই কি বলতে চান ?

— হ্যাঁ তাই। তবে ওটা হোল ট্রুথ নয় — ঐ সঙ্গে আমি তোমাকে পরামর্শ দেব মানহানির মকদ্দমা না করতে।

— কেন ?

— ধর তুমি একটা লাইবেল-এর মামলা লড়লে, মানহানিবাবদ বিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবী করে। বিচারক যদি কেসটা প্রাইমা-ফেসি জোরদার মনে করেন তাহলে ঐ পত্রিকার বিরুদ্ধে একটা Writ দিতে পারেন। পত্রিকা মামলা না চালাতে চাইলে হয়তো ত্রুটি স্বীকার করে একটা সংশোধিত সংবাদ ছাপতে পারে— অর্থাৎ প্ল্যানটা তোমারই, তবে পুলিস তোমাকে খুঁজছে না, এই মর্মে একটা বিজ্ঞপ্তি দিলেও দিতে পারে।

— আবার নাও পারে ?

— আলবাৎ! পরিবর্তে তারা মামলা লড়তেও পারে। আমার তো ধারণা এক্ষেত্রে তারা তাই লড়বে।

— কেন ?

— প্রথমত, আইনের চোখে এবং ক্যালকাটা কর্পোরেশন রেকর্ড মোতাবেক যে বাড়িটা ভেঙে পড়েছে তা তোমার ডিজাইনের। তোমার নকশা ক'তলা বাড়ির সেটা ঐ পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা নাও জানতে পারেন। তাছাড়া রিভাইজড

প্ল্যান আদৌ দাখিল করা হয়েছিল কিনা তুমি জান না। এমনও হতে পারে তা আদৌ সাবমিট করা হয়নি। সে ক্ষেত্রে আইনত তোমার প্ল্যানেই বাড়িটা তৈরি হচ্ছিল। যে-হেতু রিভাইজড প্ল্যান বলে কোন কিছু নেই সেক্ষেত্রে মামলা চলাকালীন তোমাকে প্রমাণ করতে হবে যে, চারতলা বাড়ির নকশা দাখিল করে আটতলা বাড়ি তৈরী করার নারকীয় পরিকল্পনার মধ্যে তোমার কোনও অংশ ছিল না।

— আমাকে প্রমাণ করতে হবে?

— নিশ্চয়। তুমিই তো বাদী। সংবাদপত্র তো ডিফেন্সে লড়বে। সে তো প্রতিবাদী! শোন অশোক, মাথা ঠাণ্ডা করে গোটা জিনিসটা ভেবে দেখ। আমি বুঝিয়ে বলছি:

বাসু-সাহেবের মতে 'ল অব অবসিনিটি' বা অশ্লীলতার বিষয়ে যেমন কোনও সুনির্দিষ্ট আইন নেই, 'ল অব লাইবেল' বা মানহানি মামলারও তেমনি কোনও বাঁধা-ধরা পথ নেই। কোন একটা শিল্পবস্তু অশ্লীল কিনা— এটা যেমন নৈর্ব্যক্তিক ভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় না, ঠিক তেমনি কোনও তথ্য বা পরিবেশিত সংবাদ ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে মানহানিকর কিনা তা নির্ণয় করার কোনও ওজনদাঁড়ি নেই। সচরাচর বিচারক ইতিপূর্বে দেওয়া রায়-এর নিরিখে তাঁর রায় দেন। কিন্তু প্রতিটি কেসই পৃথক। তাই কোন কেস-এ কী রায় হবে আগেভাগে বলা খুবই কঠিন।

দ্বিতীয়ত, আইনের মোটামুটি নির্দেশ:

''কোন একটি বক্তব্য মানহানিকর কিনা বুঝে নিতে গেলে দেখতে হবে সেই বক্তব্যে সাধারণ নাগরিকদের দৃষ্টিতে ব্যক্তি-বিশেষের মান অবনমিত হয়েছে কিনা। সমাজে ঐ ব্যক্তি অবহেলিত, উপেক্ষিত, হাস্যাস্পদরূপে পরিগণিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে কিনা। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে বা পরিবারগত ভাবে আর্থিক লোকসানের সম্মুখীন হয়েছেন কিনা ইত্যাদি এবং রচনা অথবা বক্তব্যটি যিনি রচনা/প্রকাশ প্রকাশ করেছেন তিনি ঐ অভিযোগকারীকে মিথ্যার আশ্রয়ে এবং অসূয়াপরবশ হয়ে (maliciously) বিপদে ফেলেছেন কিনা।''

এক্ষেত্রে অশোকের পক্ষে প্রমাণ করা অসম্ভব যে, সংবাদদাতা অসূয়াপরবশ হয়ে তাকে লোকচক্ষে হেয় করেছে। শচীন দাশশর্মা এবং অশোক মুখোপাধ্যায় পরস্পরের অপরিচিত— ফলে অসূয়ার প্রশ্নই ওঠে না। শচীন সুপরিকল্পিতভাবে অশোকের মানহানি করেনি।

তৃতীয়ত, বৃহৎ পত্রিকা এবং বড় বড় প্রকাশকেরা মানহানির জন্য নিজেদের ইন্সিওর করে রাখে। ঠিক যেমন মটোর-গাড়ির মালিক থার্ড-পার্টি ইন্সিওর করে রাখে। তুমি গাড়ি চালাতে গিয়ে পথচারীকে চাপা দিলে খেসারত দেবে ইন্সিওর কোম্পানি। ঠিক তেমনি, সংবাদপত্র মানহানিকর কোন মন্তব্য প্রকাশ করেছে এ তথ্য আদালতে প্রমাণিত হলে সংবাদপত্রের কোন মাথাব্যথা নেই। জরিমানা আদৌ দিতে হলে দেবে ইন্সিওর কোম্পানি।

অলকা বলে, অত কথার কী দরকার? আপনি আমাদের কী করতে বলেন?

বাসু-সাহেব ড্রয়ার থেকে একটা বই বার করে বলেন, আমার প্রথম সাজেসশান তোমরা এই বইটা পড়। গল্প নয়, সত্য ঘটনা সব। ট্রায়াল কেস রেকর্ডস— সাত-আটটি। প্রত্যেকটিই মানহানির মোকদ্দমা বিষয়ক। বইটা দুজনের পড়া হয়ে গেলে আবার আমার সঙ্গে এসে দেখা কর। জানিও তোমরা মানহানির মোকদ্দমা লড়বে কিনা। লড়লে, আমি তোমাদের কেসটা নেব। আমি অবশ্য এ জাতীয় কেস সচরাচর করি না। তবে তোমাদের ক্ষেত্রে করব এবং উকিলের খরচ তোমাদের লাগবে না।

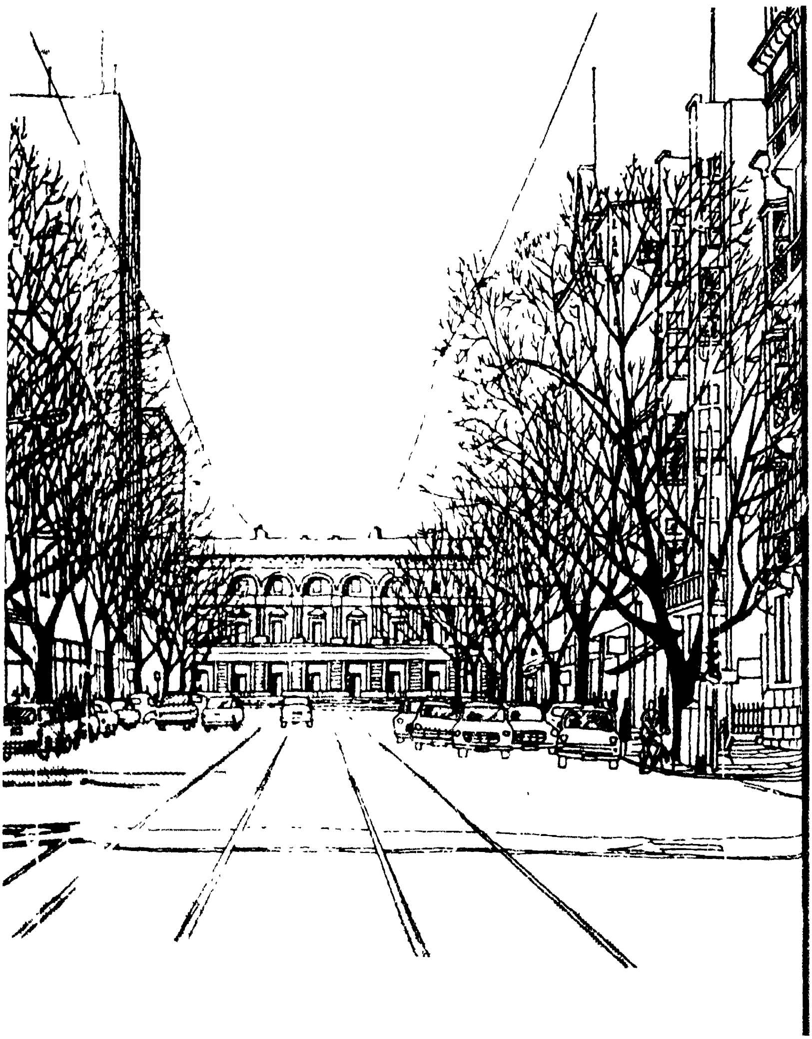

বাসু-সাহেব যে ইংরেজি বইটি ওদের পড়তে দিয়েছিলেন তাতে সাতটি মানহানি মোকদ্দমার কেস হিস্ট্রি লেখক সাজিয়েছেন। তিনটি বিদেশী, চারটি ভারতীয় আদালতের মামলা। অধিকাংশই রাজায়-রাজায় যুদ্ধ। কিন্তু দুটি ভারতীয় মানহানির মোকদ্দমার ক্ষেত্রে সাধারণ পুঁচকে রাজপুত্রের সঙ্গে বিরাটাকার দৈত্যের দ্বন্দ্বযুদ্ধ। দুটি ক্ষেত্রেই রাজপুত্র জয়ী। অর্থাৎ মধ্যবিত্তের অভিযোগকারী ক্ষমতাশালী সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মামলা করে ডিক্রি পেয়েছে।

তবু দুটি কাহিনীই বিয়োগান্ত।

প্রথম ক্ষেত্রে অভিযোগকারী একজন ডাক্তার। মধ্যবয়সী, মধ্যপশারওয়ালা। একটি বিখ্যাত পাক্ষিক পত্রিকায় তাঁর বিরুদ্ধে বিশ্রী বদনাম করা হয়। সমাজের সর্বস্তরে কীভাবে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে দেখাতে গিয়ে লেখক ঐ ডাক্তারের প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি অর্থমূল্যে অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের চিকিৎসা করে কুমারী ও বিধবা মেয়েদের 'খালাস' করার ব্যবসা করেন। ঘটনা ত্রিশের দশকের— তখন এটা ছিল নৈতিক তথা সামাজিক অপরাধ। ডাক্তারবাবু দশ হাজার টাকার ড্যামেজ দাবী করে স্যু করেন। ত্রিশের দশকে দশ হাজার টাকা বর্তমান বাজারদরে হয়তো লাখের কাছাকাছি। লেখক ছিলেন পাক্ষিক পত্রিকার সহ-সম্পাদক, এবং পত্রিকাটি কেচ্ছা বিক্রি করেই সুনাম বা দুর্নাম লাভ করে। ডাক্তারবাবু এই মামলা জেতেন। বিচারক পত্রিকাকে পাঁচহাজার টাকার জরিমানা করেন এবং মামলার খরচ বহন করতে আদেশ দেন। কিন্তু পত্রিকাটি উর্ধ্বতন আদালতে আপীল করে। আপীল আদালতের জজসাহেব পত্রিকাকে যদিচ দোষী সাব্যস্ত করলেন কিন্তু জরিমানার পরিমাণ কমিয়ে তিন হাজার টাকা ধার্য করলেন এবং আদেশ দিলেন যে, বিবদমান দুই পক্ষ যে যার মামলার খরচ দেবেন। পত্রিকাটি ইন্সিওর করা ছিল। ফলে পত্রিকার জরিমানার খরচ ইন্সিওর কোম্পানি মিটিয়ে দিল। এতদিন তারাই মামলা চালিয়েছে। অর্থাৎ পত্রিকার কোন আর্থিক দণ্ডই হল না। বরং কেচ্ছা ছাপিয়ে কিছু লাভই

করল তারা। অপর পক্ষে ডাক্তারবাবু মামলা চালিয়ে অন্তিমে দেখলেন দুই আদালতে মামলা বাবদ তাঁর মোট খরচ হয়েছে আট হাজার টাকা। তার ভিতর অবশ্য তিন হাজার টাকা তিনি ফেরত পেলেন। কিন্তু সাত বছর অবজ্ঞা করায় তাঁর পশারটা সম্পূর্ণ বেহাত হয়ে গেছে। যেসব পরিবারে তিনি ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ছিলেন তারা ঐ মামলাবাজ ডাক্তারকে ত্যাগ করে অন্যান্য ডাক্তারের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছে। মামলা জিতে ফিরে এসে ডাক্তারবাবু দেখলেন : তাঁর সংসার ভেঙে গেছে। পশার কর্পূর!

তার চেয়েও করুণ অবস্থা একজন হেডমাস্টারমশায়ের। সেটাও ত্রিশের দশকের ঘটনা। জমিদার পুত্রকে পরীক্ষার হলে টুকতে দেখে হাতে-নাতে ধরে ফেলেন। জমিদারমশাই হেডমাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন ক্ষমাঘেন্না করে ছাত্রকে ছেড়ে দিতে। সত্যনিষ্ঠ হেডমাস্টারমশাই স্বীকৃত হতে পারেন না। সেটা ইংরেজ আমল। সে যুগে শিক্ষামন্ত্রক কোনও রাজনৈতিক পার্টির নির্দেশে চলত না। জমিদার রায়-সাহেব হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পুত্রের কোনও সুরাহা করে উঠতে পারলেন না। এমনকি হেডমাস্টারমশায়ের চাকরিটি যে খাবেন সে বৈরী-নির্যাতনের তৃপ্তিও পেলেন না। যদিও স্কুলটি ঐ জমিদারমশায়েরই মাতৃস্মৃতিতে, বস্তুত তাঁরই আর্থিক দানে নির্মিত এবং তিনিই গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট। হেডমাস্টারমশায়ের চাকরি খাওয়ার চেষ্টা করায় তাঁর ডাক পড়ল লালমুখো ডিস্ট্রিক্ট কলেকটারের এজলাসে। কয়েকটা কড়া কথা শুনতে হল উপরন্তু। অগ্নিগর্ভ অবস্থায় জমিদারমশাই ফিরে এলেন বাড়িতে।

প্রতিহিংসায় ক্ষিপ্ত হয়ে জমিদারমশাই একটি স্থানীয় কাগজে দেবচরিত্র হেডমাস্টারের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করে কিছু কুৎসা প্রকাশ করলেন। অর্থমূল্যে ভাড়াটে লেখককে দিয়ে কাঁচা খিস্তি। পঞ্চাশোর্ধ্ব শিক্ষাব্রতীর সঙ্গে এক প্রতিবেশী বালবিধবা যুবতীর প্রণয়-কেচ্ছা। সম্পাদক ঋণের দায়ে ডুবতে বসেছিলেন। ঐ লেখাটি প্রকাশ করে সামাল দিলেন।

হেডমাস্টারমশাই মানহানির মামলা লড়লেন।

গোলিয়াথ বনাম ডেভিড!

ডেভিডের গুলতি-বাঁটুলের মারে গোলিয়াথ দৈত্য ভূতলশায়ী! অর্থাৎ পাঁচ বছর লড়ে মামলা জিতলেন হেডমাস্টারমশাই। হাজার টাকা অর্থদণ্ড হয়েছে সম্পাদকের। যদিও ইতিমধ্যে মাস্টারমশাই চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড-এর টাকাটা মামলার পিছনে খরচ করে বসে আছেন। কিন্তু জমিদারমশাই ছাড়বার পাত্র নন। আপীল করলেন হাইকোর্টে। আরও চার বছর চলল ঐ মামলা। বাস্তুভিটাটা এবার দেনার দায়ে বিক্রি করে দিতে হল। শেষ রায় দিলেন কলকাতা হাইকোর্ট। আপীলেও ঐ একই শাস্তি বজায় থাকল— কিন্তু বিচারক নির্দেশ দিলেন মামলায় যে-যার অংশের খরচ বহন করবে।

জমিদারমশাই হয়তো এর প্রতিবাদে প্রিভি কাউন্সিলেই যেতেন : কিন্তু ভগবান তাঁর সহায়। মামলার রায় যেদিন বার হল সেদিন সর্বস্বান্ত হেডমাস্টারমশাই মৃত্যুশয্যায়। গাঁ-শুদ্ধু লোক ভেঙে পড়েছে প্রাক্তন হেডমাস্টারমশায়ের ভাঙা কুঁড়ে ঘরের উঠানে। তাদের ভিতর অনেকেই ওঁর ছাত্র। গাঁয়ের সাক্ষর- নিরক্ষর সকলেই মানী মানুষটিকে শ্রদ্ধা করে। মাস্টারমশায়ের স্ত্রী— তাঁর তখনও সিঁথিতে সিঁদুর হাতে নোয়া-শাঁখা— একগলা ঘোমটা দিয়ে বসে আছেন মৃত্যুপথ যাত্রীর পদপ্রান্তে ; আর তাঁর নাবালক পুত্রটি কুশিতে করে গঙ্গোদক ঢেলে দিচ্ছে বাবার বিশীর্ণ ওষ্ঠাধরে। পন্ডিতমশাই মোহমুদ্গর পাঠ করে শোনাচ্ছেন।

হঠাৎ রাস্তার দিক থেকে একটা সোরগোল শোনা গেল। কী ব্যাপার? জমিদারমশায়ের পালকি এসে থামল দোরগোড়ায়। রায়সাহেব শুঁড়তোলা নাগরা মশমশিয়ে এগিয়ে এলেন। পন্ডিতমশায়ের মোহমুদ্গর পাঠ বন্ধ হয়ে গেল। রায়-সাহেব হাঁকাড় পাড়েন, মাস্টারমশাই! শুনতে পাচ্ছেন? আনন্দ সংবাদটা নিজেই দিতে এলাম। মামলায় আপনার জিৎ হয়েছে! কারণ আমি প্রিভি কাউন্সিলে যাচ্ছি না।

হেডমাস্টারমশায়ের চোখ দুটো খুলে গেল। তিনি বুঝে উঠতে পারলেন কি না বোঝা গেল না। পণ্ডিতমশাই ঝুঁকে পড়ে তাঁর কর্ণমূলে বললেন, তারক ব্রহ্ম, তারক ব্রহ্ম!

রায-সাহেব জনতার দিকে ফিরে বললেন, সিধুখুড়ো আছেন, বাচস্পতিমশাইও আছেন, আপনাব হয়তো জানেন না, ওঁর ভদ্রাসনখানি আমিই বেনামীতে কিনে নিয়েছি। কিন্তু শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে যাবার আগে আমি দখল নিতে আসব না। ওঁরা এ বাড়িতেই যেন ছেরাদ্য-টেরাদ্য করেন। হাজার হোক উনি মানী লোক। আর— ও ভাল কথা...আপনারা অনুগ্রহ করে দেখবেন ; ঐ সর্বস্বান্ত নিঃস্ব মানী লোকটাকে যেন বাঁশে বেঁধে শুয়োর-ঝোলা করে শ্মশানে না নিয়ে যায়। খাজাঞ্চিমশাইকে বলে দিয়েছি, চাইলেই সে একটা খাটিয়ার দাম দিয়ে দেবে। সেটা আমার — কী বলে ভাল— বোঝার উপর শাকের আঁটি— অর্থাৎ ঐ হাজার টাকা জরিমানার উপর মানী মানুষের মান রক্ষা! আর তাছাড়া জানেনই তো : মান মানে কচু! কচু অতি উপাদেয় জিনিস। কচু অনেক প্রকার, যথা— মানকচু, ওলকচু, কান্দাকচু, পানিকচু....

—বাকিটা শোনা গেল না সদ্য-বিধবার গগনবিদারী আর্তনাদে!

গ্রন্থের লেখক তাই পাঠককে সাবধান করে উপদেশ দিয়েছেন, প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করার আগে সহস্রবার চিন্তা করে দেখবেন। স্বজন-বন্ধুরা হয়তো পরামর্শ দেবে মামলা লড়তে, কিন্তু প্রায় সর্বযুগে সর্বকালেই দেখা গেছে, আইন সেদিকেই ঢলে পড়েছে যেদিকে আর্থিক কৌলিন্যের পাল্লা ভারী!

দুজনেই বইটা পড়ে শেষ করল।

অলকা বলে, বাসু মেসো ঠিকই বলেছিলেন। 'সঞ্জয় উবাচ' মস্ত কাগজ। অসীম তাদের আর্থিক ক্ষমতা। তাদের সঙ্গে মামলা লড়তে যাওয়া মূর্খামি।

— তাই বলে ডাহা মিথ্যাটা মেনে নেব?

— কী করবে বল তাছাড়া?

— আমি সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বুঝিয়ে বলব।

— সম্পাদক! 'সঞ্জয় উবাচ' পত্রিকার সম্পাদক কত উঁচুতলার মানুষ সে খেয়াল আছে? তুমি চাইলেই তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করবেন?

— কী আশ্চর্য, আমি তাই বলেছি? তিনি ব্যস্ত মানুষ, মস্ত মানুষ — তাহলে তাঁর পাঁচ-সাতজন সহকারী নিশ্চয় আছে। তাদেরই একজনকে ধরে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেব। আমি তো একথা বলছি না যে, পত্রিকা আমার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করুক। পূর্ব প্রকাশিত সংবাদটা যে ভুল একথা জানিয়ে আর একটা বিজ্ঞপ্তি দিলেই তো আমি খুশি। প্রথম কথা: জনসাধারণের জানা দরকার যে, আমি একটা চারতলা বাড়ির প্ল্যান তৈরী করেছিলাম। দ্বিতীয় কথা, আমার বাড়িতে কোনও পুলিস হামলা হয়নি, পুলিস আমাকে আদৌ খুঁজছে না। বুঝিয়ে বললে ওরা এটা প্রকাশ করবে না কেন? তুমি টেলিফোন ডাইরেক্টারিটা এগিয়ে দাও দিকিন!

রিঙিং টোন দুবার হতেই ও প্রান্তে মধুকণ্ঠে একটি মহিলা বললেন: 'সঞ্জয় উবাচ'! বলুন?

অশোক বললে, লাইনটা এডিটারকে দেবেন, কাইন্ডলি?

— এডিটার! আপনি কে বলছেন?

— নাম বললে তো চিনবেন না, আমার নাম অশোক মুখার্জী, মুখার্জী অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস্ কোম্পানির প্রোপ্রাইটার....

— গুড আফটারনুন, মিস্টার মুখার্জী। কিন্তু সম্পাদককে আপনি কেন খুঁজছেন কাইন্ডলি জানাবেন?

— সে অনেক কথা। 'সঞ্জয় উবাচ' পত্রিকায় সাতই জুন প্রকাশিত একটা নিউজ আইটেমের বিষয়ে,...

—সে দ্যাট! তাহলে এডিটার নয়, আপনি নিউজ এডিটারের সঙ্গে কথা বলুন।

লাইনে আভ্যন্তরিক কিছু কথাবার্তা শোনা গেল। বার্তা সম্পাদক রিসেপশানিস্টকে ঋষভকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, ইয়াস? এবং তারপরই মধুকণ্ঠী তাঁকে বললেন, কাইন্ডলি এই বাইরের কলটা অ্যাটেন্ড করুন, স্যার। সাম মিস্টার মুখার্জী সেভেন্থ জুন পাবলিশড্ কী একটা নিউজ-এর বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

ঋষভকণ্ঠ অনুমতি দিলেন।

মধুকণ্ঠী এবার অশোককে বললেন, প্লীজ স্পিক হিয়ার, স্যার।

অশোক বার্তা-সম্পাদককে সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানাতে গেল। মুখপাতটুকু করতে না করতেই উনি ভারী গলায় বললেন, এসব টেলিফোনে হয় না মশাই। আপনার যা বক্তব্য তা একটা চিঠিতে লিখে জানান। ব্যবস্থা যা নেবার আমরা যথাবিহিত নেব।

অশোক বলে, দেখুন চিঠি আমি ইতিপূর্বেই লিখেছি..

বাধা দিয়ে উনি বলে ওঠেন, দ্যাটস ফাইন! টেকন দ্য রাইট স্টেপ। নাউ ইউ জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড সী...

অশোক বলতে গেল যে, জবাব সে পেয়েছে, কিন্তু বার্তা-সম্পাদক সে কথা শুনতে চাইলেন না। কিসের প্রভাব বোঝা গেল না। অফিসে বসে নিশ্চয় উনি মদ্যপান করেন না। কিন্তু তিনি মুড-এ ছিলেন। বললেন, লুক হিয়ার মিস্টার ব্যানার্জী। আমরা সবাই অন্ধ! ছুঁচোর মতো অন্ধ! চক্ষুষ্মান একমাত্র সঞ্জয়! এ কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে কোথায় কী ঘটছে সবই তিনি দেখতে পাচ্ছেন। তাই বলে কি আমরা নিষ্কর্মা? নো! নেভার! মিল্টন বলেছেন, অন্ধরা শুধু অপেক্ষা করবে! শুধুই অপেক্ষা করবে— 'দে অলসো সার্ভ হু ওনলি স্ট্যান্ড অ্যান্ড ওয়েট!' ফলো?

অশোককে কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে পণ্ডিত বার্তা-সম্পাদক টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন।

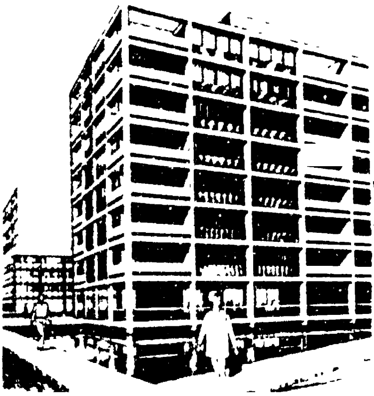

কিন্তু অত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র অশোক মুখুজ্জে নয়। পরদিন সকালে সে গাড়ি নিয়ে স্বয়ং হাজিরা দিল 'সঞ্জয় উবাচ' হাউসে।

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুর উপর প্রকাণ্ড প্রাসাদ। সাত অথবা আটতলা বাড়ি। গেট-এ দারোয়ান। কাউন্টারের ওপাশে একটা সোফা আছে। বিশেষ বিশেষ সাক্ষাৎপ্রার্থীকে রিসেপশানিস্ট বলছে, বসুন। খবর দিচ্ছি। অধিকাংশই দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রতীক্ষায় আছে। এজন্য কর্মকর্তাদের দোষ দেওয়া যায় না। নানান জাতির সাক্ষাৎপ্রার্থীরা ক্রমাগত আসছেই আর আসছেই। অধিকাংশই আসছে তাদের পাড়ার ফাংশন, খেলা, থিয়েটার ইত্যাদি কোন কিছুর সংবাদটা যদি প্রকাশ করানো যায়। কারও হাতে-আঁকা ছবির প্রদর্শনী হচ্ছে, কেউ লেখা দিয়েছে জবাব পায়নি। তাই সম্পাদকীয় দপ্তরে একটু তৈলমর্দন করতে চায়। রিসেপশান কাউন্টারে পাশাপাশি তিনজন। একজন মাঝবয়সী প্রৌঢ়। দুজন তরুণী। প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সন্দিগ্ধ দৃষ্টিকে কেমন যেন সুবিধার মনে হল না।

অপর দুটি তরুণীর মধ্যে যার সামনে সাক্ষাতেচ্ছুর লাইনটা হাল্কা সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল কাউন্টারে।

— ইয়েস ? কার সঙ্গে দেখা করতে চান বলুন ?

বিবাহিতা কিনা বোঝার উপায় নেই। অলকার চেয়ে দু-চার বছরের বড়ই হবে। বঙ ময়লা, প্রচুর প্রসাধন সত্ত্বেও তা বোঝা যায়। ভ্রূটা প্লাক করে আঁকা। অশোক বলে, তা তো ঠিক বলতে পারছি না। আমার সম্বন্ধে কাগজে একটা খবর বার হয়েছে সেই বিষয়ে...

— কোন কাগজ ? দৈনিক না সাপ্তাহিক ?

— 'সঞ্জয় উবাচ' -তে।

— কত তারিখ ? কোন পাতায় ?

— সাতই জুন। প্রথম থেকে তৃতীয় পাতায় ক্যারেড ওভার।

— তার মানে জেনারেল্স নিউজ সেকশান। কলকাতার খবর তো? না মফঃস্বলের?

— কলকাতার। যাদবপুর এলাকার।

রিসেপশানিস্ট মেয়েটি ওকে অপেক্ষা করতে বলে ভিতরের কোন একটা সেকশানে টেলিফোনে ট্যাপ করলেন। ও প্রান্তে সাড়া জাগতেই ভিজিটার্স স্লিপ— যেটা আগেই ভর্তি করে অশোক দাখিল করেছে— দেখে বললেন, মিস্টার এ.মুখার্জী, আর্কিটেক্ট, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান একটা পাবলিশড নিউজ-এর ব্যাপার।

টেলিফোনে ও প্রান্তবাসীর কঁককঁক কী যেন শব্দ ভেসে এল। রিসেপশানিস্ট তাঁকে বললেন, অল রাইট স্যার, নিন পার্টির সঙ্গে কথা বলুন।

রিসিভারটা ভদ্রমহিলা বাড়িয়ে ধরলেন অশোকের দিকে।

— ইয়েস, মিস্টার মুখার্জী? বলুন, আমি কী করতে পারি?

চেনা কণ্ঠস্বর। গতকাল ইনিই মিল্টনের 'অন হিজ ব্লাইন্ডনেস' সনেটের চতুর্দশতম চরম পংক্তিটি আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। অশোক বললে, টেলিফোনে তো হবে না, স্যার, আমাকে যদি পাঁচ মিনিট সময় দিতেন তাহলে মুখোমুখি বসে...

— পাঁচ কি পঁচিশ সেটা নির্ভর করছে বিষয়বস্তুব উপর। কোন সংবাদের প্রসঙ্গে কথা বলতে চান?

— সাতই জুন 'সঞ্জয় উবাচ' পত্রিকায় যে খবরটা ছাপা হয়েছে, ঐ সন্দীপ ধনপতিয়ার বাড়িটা ভেঙে পড়ার বিষয়ে... আই মীন...

— জাস্ট এ মিনিট, মিস্টার মুখার্জী! আপনিই কি সেই অধঃপতিত প্রাসাদটির আর্কিটেক্ট? মেসার্স মুখার্জী অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটের মালিক কী সাম মুখার্জী?

— ইয়েস অ্যান্ড নো, স্যার! অর্থাৎ 'কী সাম নয়', আমি অশোক মুখার্জী। ঐ ফার্মের মালিক এটা ফ্যাক্ট, কিন্তু অধঃপতিত প্রাসাদটির আর্কিটেক্ট নই— এই কথাগুলিই আপনাকে বুঝিয়ে বলতে চাই।

— আই সী! কিন্তু গতকালই তো আপনাকে আমি বলেছি, এ নিয়ে আলোচনা করার কিছু নেই। আপনার যা বক্তব্য তা একটা চিঠিতে লিখে আমাদের সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠাবেন।

অশোক চিঠি লেখার প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলল, দেখুন স্যার, আমি অফিস কামাই করে আপনার সঙ্গে এতদূরে দেখা করতে এসেছি, অ্যান্ড য়ু নো দ্যাট টাইম ইজ মানি ফর আস— সেলফ-এমপ্লয়েড আর্কিটেক্ট—

— আজ্ঞে না! তা আপনি করেননি। কাল আমার জানা ছিল না কিন্তু আজ আমি জানি— খবরটা পড়ে সর্বপ্রথমেই আপনি একটি উকিলের, আই মীন ব্যারিস্টারের চিঠি দিয়ে আমাদের হুমকি দিয়েছেন। তাই না? লুক হিয়ার মিস্টার

মুখার্জী! ব্যাপারটা আর আমার এক্তিয়ারে নেই। আপনি রিসেপশানিস্টকে বলুন যে, মের্সাস ঘোষ অ্যান্ড ঘোষের পার্টনার অ্যাডভোকেট মহেন্দ্রনাথ ঘোষ-এর সঙ্গে আপনি দেখা করতে চাইছেন। উনি আমাদের লীগ্যাল অ্যাডভাইসার...

— কিন্তু আমি তো মামলা....

ও প্রান্তবাসী ক্রেড্‌ল্-এ টেলিফোন- যন্ত্রটা নামিয়ে রাখলেন।

ওর হতভম্ভ ভঙ্গি দেখে বোধকরি রিসেপশানিস্ট মেয়েটির করুণা হল। নিঃশব্দে ওর হাত থেকে যন্ত্রটা নিয়ে নিজের কানে চেপে ধরে দেখল, সেটা ডেড। বললে কী হল ? উনি দেখা করতে রাজি হলেন না ?

অশোক একটা ছলনার আশ্রয় নিল! মহেন্দ্র ঘোষ-এর সঙ্গে দেখা করে লাভ নেই। সেখানে আইনের ধারা মোতাবেক কথা বলতে হবে। ওর মনে হল, তার চেয়ে ভাল হয় যদি বার্তা-সাংবাদিক শচীন দাশশর্মাকে আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা যায়। শচীনবাবুর সঙ্গে ওর কোনও শত্রুতা নেই। সেও হয়তো ওরই বয়সী। ছা-পোষা মানুষ। ওর সমস্যার কথাটা সে ভদ্রলোক না বুঝবে কেন? ‘সঞ্জয় উবাচ’ একটা বহুলপ্রচারিত দৈনিক পত্রিকা। সন্দীপ ধনপতিয়ার প্রাসাদ ভেঙে পড়া একটা মুখরোচক খবর। কয়েক লক্ষ লোক সেটা খুঁটিয়ে পড়েছে। তার ভিতর যে কয়শত পাঠক-পাঠিকা অশোক মুখার্জীর পরিচিত, আত্মীয়, বন্ধু বা ক্লায়েন্ট তারা সবাই নিশ্চয় আঁৎকে উঠেছে। কী সর্বনাশ! অশোক মুখুজ্জে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে আন্ডার-গ্রাউন্ডে! এ যে চিন্তাই করা যায় না! তার ব্যবসায়ে ক্ষতি হতে শুরু করেছে প্রথম থেকেই। সংবাদ পাঠমাত্র রামশরণজী ওকে না-হোক বিশ হাজার টাকার দাগা দিয়ে গেছে। এসব কথা যদি ঐ শচীন দাশশর্মাকে বুঝিয়ে বলা যায়, তাহলে কি তার দয়া হবে না? ইতিপূর্বে নিজ বিশ্বাসমতো যে সংবাদটা সে প্রকাশ করেছিল সেটা ভুল তথ্যের ওপর নির্ভর করে। তাতো হতেই পারে। ভুলকে ভুল হিসাবে বুঝতে পারার পর সেটা শোধরানোই তো মনুষ্যত্ব। জার্নালিস্টস এথিক্যাল ইন্টিগ্রিটি। শচীনবাবু যদি নিজে থেকেই পরবর্তী সংবাদ পরিবেশনের সময় কায়দা করে জানিয়ে দেয় যে, পুলিস এখনো সেই পলাতক আর্কিটেক্টকে খুঁজে পায়নি বটে, তবে সে লোকটা মুখার্জী অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেস্ এর মালিক অশোক মুখুজ্জে নয়, তাহলেই কেল্লা ফতে। তাছাড়া এটাও পাঠক-পাঠিকাদের জানতে দেওয়া উচিত যে, শচীনবাবুর পূর্ব-পরিবেশিত সংবাদটা আদ্যন্ত ভ্রান্ত ছিল না। মুখার্জী কোম্পানিই প্রাথমিক নকশাটা দাখিল করে— কিন্তু সেটা ছিল চারতলা বাড়ির। সে সিটি-আর্কিটেক্টকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছিল যে, বাড়িটার সুপারভিশান দায়িত্ব সে স্বীকার করছে না। ফলে সেই চারতলা বাড়ির প্ল্যান অবলম্বনে যদি ধনপতিয়া আর কর্পোরেশনের কোনও অসৎ কর্মচারী একটা আটতলা প্রাসাদ...

— কী হল ? কিছু বলছেন না যে ? উনি দেখা করতে রাজি হলেন না ?

অশোক বললে, না! আমার মনে হচ্ছে এক্ষেত্রে শচীনবাবুর সঙ্গে যদি একবার

কথা বলা যেত...

— শচীনবাবু? শচীন দাশশর্মা? নিউজ সেকশানের?

— হ্যাঁ, তাই। তাঁর কি এখন ডিউটি আছে?

—দাঁড়ান দেখি।

থাকলে শচীন দাশশর্মা ঐ নিউজ রুমেই থাকবে। রিসেপশানিস্ট পুনরায় সেখানে ট্যাপ করে জানতে চাইল, শচীনদা আছেন?

— দাশশর্মা? না সীটে নেই। দেখছি। এই কেষ্টা। দ্যাখ তো দাশশর্মা কোথায় গেল। টেলিফোন আছে তার...

শেষ পংক্তি দুটি নিউজ রুমের সেবকের প্রতি প্রযোজ্য। যদিও সে নির্দেশ দেওয়ার সময় কথা মুখে হাত চাপা দেওয়া না থাকায় শুনতে পেল রিসেপ্‌শানিস্ট মেয়েটি। পরক্ষণেই শোনে, বাই দ্য ওয়ে! শচীনকে কে খুঁজছে বলতো? তুমি? না সেই ছিনে-জোঁক অশোক মুখুজ্জে?

নিউজ এডিটার রাশভারী লোক। অনেক সিনিয়ার। মেয়েটি সত্য গোপন করতে সাহস পেল না। শুনেই নিউজ এডিটর বললেন, ঠিক ধরেছি! রিসিভারটা দাও তো ঐ মামলাবাজ মুকুজ্জেকে।

মেয়েটি নিঃশব্দে রিসিভারটা অশোকের দিকে বাড়িয়ে ধরে। আশোক বুঝতে পারেনি যে, শচীন দাশশর্মা নয়, আবার সে ঐ একই নিউজ এডিটারের মুখোমুখি না হলেও 'মুখোকানি' হয়েছে। আত্মপরিচয় ঘোষণা করা মাত্রেই ও-প্রান্ত থেকে একটা টাইফুন বয়ে গেল। অশোক সে ঝড়ের দাপট সামলে কোনক্রমে বললে, কিন্তু আমি যে ধনেপ্রাণে মরতে বসেছি, দাদা। আপনাদের পরিবেশিত ভুল খবরে সমাজে আমি অপমানিত, অবহেলিত। আমার বিজনেসের ক্ষতি হচ্ছে। আমি কী করতে পারি? বারে বারে অ্যাপীল করা ছাড়া? আমার কথাটা আপনারা শুনতেই চাইছেন না...

—কেন? উকিলের চিঠি দিয়েছেন! মামলা করুন। মানহানির মোকদ্দমা!

—তাই কি পারি? আমি সামান্য মধ্যবিত্তের মানুষ....

—আজ্ঞে না, মধ্যবিত্তের মানুষ ক্ষুব্ধ হলে প্রতিকার চেয়ে উকিলের চিঠি দেয়। শুধু ধনকুবেরেরা দেন ব্যারিস্টারের নোটিশ। ফলো?

—আপনি আমার কথাটা শুনবেন একটু?

—আজ্ঞে না। আপনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। মামলা চান, মামলা। না চাইলে, খুন-জখম-আত্মহত্যা—যা খুশি। ওন্‌লি প্লীজ ডোন্ট ডিস্টার্ব আস্ এগেন!

রিসিভারটা যথাস্থানে ফিরে গেল ও-প্রান্তে।

নিউজ-এডিটর এত উচ্চকণ্ঠে কথা বলছিলেন যে, কর্ণপটহের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে অশোক যন্ত্রটা কয়েক ইঞ্চি দূরে ধরে রেখেছিল। গাঁক-গাঁক বন্ধ

হওয়া মাত্র রিসেপশানিস্ট মেয়েটি ওর হাত থেকে যন্ত্রটা নিয়ে রিসিভারে রেখে দিল। মিষ্টি হেসে বলল, আয়াম সরি!

অশোক ম্লান হেসে বললে, য়ু নীডন্ট বি! কিন্তু আপনাদের নিউজ-এডিটার যে তিনটি সাজেশান দিলেন তাব কোনটি আমার গ্রহণ করা উচিত বলুন তো? আপনি কী পরামর্শ দেন?

মেয়েটি পুনরায় সান্ত্বনাদায়ী অনাবিল হাসি হেসে বললে, একটাও নয়। 'খুন জখম-আত্মহত্যা' একটাও এ সমস্যার সল্যুশান নয়।

—তাহলে সমাধানটা কী?

ইতিমধ্যে লাইনে আরও দু-একজন এসে দাঁড়িয়েছে।

মেয়েটি ওকে বললে, প্লীজ ওয়েট। ঐ সোফায় গিয়ে বসুন।

পর পর সাত-আটটি সাক্ষাৎপ্রার্থীর স্লিপ ডিসপোজ করে মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। ভিতর থেকে আর একজন প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা এসে বসলেন ওর সীটে। ও সুইং-ডোর ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এসে বলল, আসুন আমার সঙ্গে।

কোথার তা জানতে চাইল না আশোক। মেয়েটির পিছন পিছন উঠে এল। দুজনেই নামল রাস্তায়। এবার অশোক প্রশ্ন করে. আপনার কি ডিউটি খতম হয়ে গেল?

—না। পনেরো মিনিটের কফি-ব্রেক।

—তাহলে চলেছেন কোথায়? ক্যান্টিনে?

—না। সেখানে আমাকে সবাই চেনে। আমরা গিয়ে বসব রাস্তার ওপারে ঐ ইন্ডিয়ান কফি হাউসে।

—পনেরো মিনিটেব ভিতর ওখান থেকে কফি পান করে ফিরতে পারবেন?

—না, পারব না। তবে আমার এখন কফি পানের কোন ইচ্ছা নেই। আমি শুধু আপনাকে এক কাপ কফি খাওয়াব। দামটা মিটিয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যে ফিতে আসতে অসুবিধা হবে না।

—হঠাৎ এ সিদ্ধান্ত?

—যাতে আপনি বুঝতে পারেন 'সঞ্জয় হাউস'-এর সবাই অভদ্র নয়। আমি আপনার কেসটা মোটামুটি জানি, মিস্টার মুখার্জী। আর কেন আপনি শচীনদার সঙ্গে দেখা করতে চান তাও আন্দাজ করতে পারি।

কফি-হাউসের একান্তে দুজনে মুখোমুখি বসল। ঘটনাচক্রে তখনই একজন কফিসেবক এসে অর্ডার নিয়ে দু-কাপ কোল্ড কফি তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিয়ে গেল।

অশোক বলল, ঘটনাচক্রে আপনি আমার নামটা জানেন....

মেয়েটি ঠোঁট উল্টে বললে, দু-কাপ কফি পান করার অবকাশে যখন নাম ডাকাডাকির সময় বা সুযোগ হবে না, তখন কী দরকাব ব্রেনের গ্রে-সেলগুলো ভারাক্রান্ত করার?

—তাহলে বলুন, মিস অর মিসেস্ রিসেপশানিস্ট! আপনি আমার কেস সম্বন্ধে মোটামুটি কী জানেন?

মেয়েটি খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে। বলে, আপনি নাছোড়বান্দা! আমার নাম আরতি মিত্র। মিসেস্ মিত্র।

—কিন্তু আপনি আমার মূল প্রশ্নটার জবাব এখনো দেননি, মিত্রাণী।

আরতি ওর সম্বোধনে মুখ টিপে হাসল। বলল, শচীনদাও এতদিনে জানে, ভৈরববাবুও জানেন যে, সে-রাত্রে পুলিস আপনার বাড়ি রেইড করেনি!

—ভৈরববাবু মানে নিউজ-এডিটর?

আরতি সম্মতিসূচক গ্রীবাভঙ্গি করে। বলে, আপনি যদি প্রীডার্স নোটিস না দিয়ে নিজেই যোগাযোগ করতেন তাহলে হয়তো শচীনদা খবরটা ছেপে দিত। ফর য়োর ইনফরমেশন, সন্দীপ ধনপতিয়া আপনাব চারতলা বাড়ির প্ল্যানটা উইথড্র করে একটা আটতলা বাড়ির প্ল্যান-ডিজাইন সাব্‌মিট করেছিল—যা স্যাংশন হয়নি। হবার কথাও নয় নাকি। তবু ধনপতিয়া মিস্টার ভার্মার সুপারভিশানে একের-পর এক তলা গেঁথে চলেছিল।

—'ভার্মা'টা কে?

—রাকেশ ভার্মা। এনলিস্টেড আর্কিটেক্ট। যে লোকটা আপনার দ্বিগুণ বা তিনগুণ চার্জ নিয়ে ঐ রিভাইজড প্ল্যান সাবমিট করেছে, এ-কথা জেনে যে, তা কোনদিন পাস হবে না!

—আপনি এত কথা জানলেন কী করে?

—প্রবীর মিত্র আমাকে বলেছে। সে ছিল আলোচনার সময়। যখন স্থির হয়—ঐ আপনার প্রীডার্স নোটিস পাওয়ার পরে— যে, এ সম্বন্ধে আর কোন খবর ছাপা হবে না, মহেন্দ্রবাবুর পরামর্শ ছাড়া—

—প্রবীর মিত্রটি কে?

—মিত্রাণীর 'মিত্র'! যাঁর আয়ুষ্কামনায় সিঁথিতে সিঁদুর দিই।

—দেন?

—দিই!—আরতি তার সিঁথিমূলের একগুচ্ছ চুল সরিয়ে দিল। পরক্ষণেই হাতবটুয়া খুলে আয়নায় দেখে দেখে মুখটা মেরামত করতে বসল।

অশোক বলল, আশ্চর্য! আপনারা বিবাহিত হলে তা গোপন করতে চান কেন বলুন তো?

—উইমেন্‌স্ লিব্। যতদিন সমাজ বিবাহিত পুরুষের ক্ষেত্রে কপালে ত্রিপুণ্ড্রক অথবা গলগণ্ডের উপর কণ্ঠিধারণ বাধ্যতামূলক না করছে...

—তাহলে সিঁদুর পরে তা চুল দিয়ে ঢাকেন কেন?

—সবাই করে না। আমি করি। 'সংস্কারের কৈঙ্কর্য' বলতে পারেন। মা-ঠাকুমা-দিদিমাদের জীন-এর প্রভাবে! কিন্তু এবার আমাকে উঠতে হবে।

আবতিই দু-কাপ ঠাণ্ডা কফির দাম মেটালো। পথে নেমে 'সঞ্জয় উবাচ' হৌসের দিকে পাশাপাশি চলতে চলতে অশোক প্রশ্ন করে, আমার মূল প্রশ্নটার জবাব কিন্তু আপনি এখনো দেননি আবতি দেবী। সেটা এখনো মূলতুবিই আছে। আমি জানতে চেয়েছিলাম— 'খুন-জখম-আত্মহত্যা' তিনটের একটাও যদি না করি, তাহলে আমি কী করতে পারি? আপনি তখন আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন।

—না, আমি বলিনি। ভৈরববাবু বলেছিলেন। মিল্টনের কোটেশন শুনিয়েছিলেন আপনাকে : 'দে অল্‌সো সার্ভ হু ওন্‌লি স্ট্যান্ড অ্যান্ড ওয়েট।'

—আর আপনি তাহলে আমাকে কী শোনাবেন?

—অন্য একটি উদ্ধৃতি...

—বিদায় নেবার সময় তো হল। এবার শোনান তাহলে?

—'এভরি-ওয়ান হ্যাজ টু বিয়ার ওয়ান্'স ঔন ক্রস্!'

খাঁটি কথা!

যীশুখ্রীষ্টকে যখন বধ্যভূমির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন বৃহদায়তন ক্রুশকাষ্ঠটি বয়ে নিয়ে যেতে গিয়ে ক্ষীণকায় মহামানব বারে বারে ভূতলশায়ী হচ্ছিলেন।

পথের দুধারে দণ্ডায়মান দর্শকদলের মধ্যে ছিল একজন যীশুভক্ত।

সে এগিয়ে এসে বলেছিল, প্রভু! আমাকে দিন। ওটা আমিই বয়ে নিয়ে যাব।

যীসাস স্বীকৃত হননি।

বলেছিলেন, না ভাই, তা হয় না। প্রত্যেকে নিজেই নিজের ক্রুশকাঠ বইবে—এটাই হচ্ছে নিয়ম!

'সঞ্জয় উবাচ'র কতিপয় স্বেচ্ছাচারীর নিক্ষিপ্ত বজ্রাঘাতের সবটুকু যন্ত্রণা একা তাকেই সইতে হবে! সে আঘাতে যেন অলকা অথবা মিঠুন হুমড়ি খেয়ে না পড়ে এটুকু-ও তাকেই দেখতে হবে।

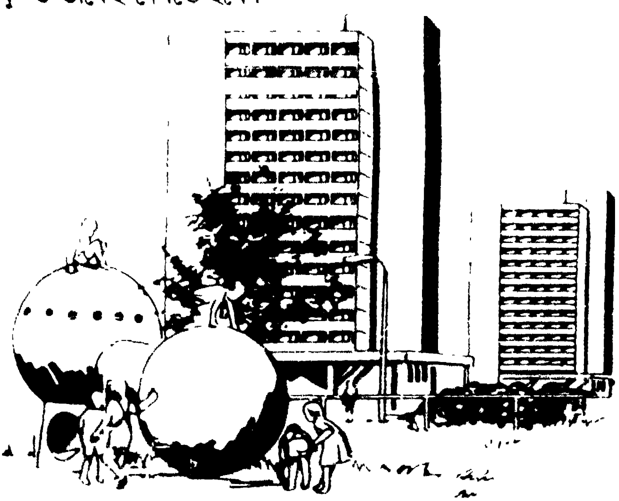

গ্লাসটপ টেবিলের এ-প্রান্তে দুজন বসেছিল। ভিজিটার্স চেয়ারে। বাসু-সাহেব পাইপে তামাক ঠেশতে-ঠেশতে আড়চোখে ওদের দেখে নিলেন একবার। তারপর বললেন, নাউ টেল মি! ইজ দ্য জুরি ইউন্যানিমাস অর আর দে ডিভাইডেড?

অশোক হেসে ফেলে। বলে, ভাগ্যে ইংরেজি ব্যাকরণে দ্বিবচন নেই, স্যর!

—একথা কেন?

—ইংরেজি মতে জুরি একমত হলে একবচন, বহুমৎ হলে বহুবচন। কিন্তু সংস্কৃতে আবার বহুবচন ছাড়াও দ্বিবচনও আছে কিনা।

বাসু বলেন, যুক্তিটা তোমার ভ্রান্ত, অশোক। জুরির বিচার ইদানীং হয় না। তাই তোমরা জান না। বহুমত হবার কোন অবকাশই ছিল না জুরির। তার লক্ষ্মণের গণ্ডি ছোট্ট: হয় 'গিল্টি' অথবা 'নট-গিল্টি'। তৃতীয় বিকল্প কিছু থাকত না।

অলকা বলে, আপনারা কী ভাষায় কথা বলছেন, মেসো? বাঙলা?

—বৈয়াকরণিকের ভাষায়। তোমার কর্তাটি ব্যাকরণে পাণ্ডিত্য ফলাতে চাইছিলেন: 'আসে গুটি গুটি বৈয়াকরণ/ ধূলিভরা দুটি লইয়া চরণ।' বৈয়াকরণের ঠ্যাঙের কাদাটা কী করে ধুয়ে ফেলা যায় সেটাই সর্বাগ্রে দেখতে হবে। সুতরাং বল, তোমরা দুজনে শেষ পর্যন্ত কী স্থির করলে? মানহানির মোকদ্দমা হবে, না হবে না?

অশোক বলে, অলকার মতে...

—অলকার মত অলকার মুখেই শুনব। অলকাপতির কী মত?

—লেডিজ ফার্স্ট— স্যর।

—অলরাইট! অলকা কী বল?

অলকা বললে, আপনি যে বইটা পড়তে দিয়েছিলেন মেসো, তাতে আটটা কেস ছিল মানহানির মোকদ্দমা বিষয়ে। আটটা কেস-এর চুম্বকসার লেখক একটি ছোট্ট উদ্ধৃতিতে আমাদের শুনিয়ে দিয়েছেন। আমি সেটা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছি।

—কী উদ্ধৃতি ?

—সুকুমার রায়ের 'হযবরল' থেকে, ''এটা মানহানির মোকদ্দমা। সুতরাং প্রথমেই বুঝতে হবে 'মান' কাকে বলে। মান মানে কচু। কচু অতি উপাদেয় জিনিস। কচু অনেক প্রকার—মানকচু, ওলকচু, কান্দাকচু...''

বাসু বললেন, তা ঠিক। তবে কচুগাছের মূলকে কচু বলে। সুতরাং বিষয়টার একেবারে মূল পর্যন্ত যাওয়া দরকার। অশোক এই 'মূলে হা-ভাত' প্রসঙ্গে কী বলছ ?

অশোককে একটু ম্লান দেখাচ্ছে। বললে, অলকা ঠিকই বলেছে। গরিবের আবার 'মান' কী ? আপনি যে বইটি পড়তে দিয়েছিলেন তাতে যে কটি কেস-এ বাদী জিতেছে সে-কটি ক্ষেত্রেই তারা সর্বস্বান্ত হয়ে জিতেছে। সুতরাং অলকা সাবধানী গৃহিণীর মতোই সিদ্ধান্ত নিয়েছে...

বাসু বলেন, দেখ অশোক, সাতই জুনের খবরটা আজ সতেরই জুনের মধ্যে সবাই ভুলে গেছে। অবশ্য তুমি ভুলতে পারনি। কারণ তোমার জুতোর ভিতরেই কাঁটাটা জেগে আছে, তোমাকে ক্রমাগত খোঁচাচ্ছে। তা হোক, ওটা অভ্যাস হয়ে যাবে ক্রমশ। রামশরণজী নিজে থেকেই ফিরে আসতে পারে, যখন সে জানবে খবরের কাগজের সংবাদটা ঠিক ছিল না। তোমাকে পুলিস আদৌ খুঁজছে না।

অলকা বলে, আমাদের চেনা-জানা অধিকাংশই ইতিমধ্যে জেনে গেছে যে, 'সঞ্জয় উবাচ'তে খবর যেটা বার হয়েছিল তা ভুল। হয়তো যেসব আত্মীয়-পরিজন দূরে আছেন—কাশী, বোম্বাই, জামসেদপুরে—তাঁরা এখনো খবর পাননি। ক্রমশ পাবেন। নয় কি ?

বাসু বলেন, আরও একটা দিক বিবেচনা করার আছে। তোমরা যদি মামলা কর, তাহলে ওপক্ষ বাধ্য হয়ে তোমার গায়ে কাদা ছিটোবে। যতই ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা কর, কিছুটা কাদা গায়ে লেগে থাকবেই। তোমাকে প্রমাণ করতে হবে যে, চারতলা বাড়ির প্ল্যান দাখিল করে রাতারাতি আটতলা বাড়ি বানানোর নারকীয় পরিকল্পনার পিছনে তোমারও হাত ছিল না।

—সেটা প্রমাণ করা শক্ত নয়। ইতিমধ্যে যে-লোকটা আটতলা বাড়ির প্ল্যান দাখিল করেছে সেই রাকেশ ভার্মার পাত্তা পাওয়া গেছে—

—কিন্তু সে তো তোমার বেনামদার।

—আমার বেনামদার ? কী বলছেন আপনি ?

—না, আমি বলছি না, অশোক। বলবেন, 'সঞ্জয় উবাচ'র কাউন্সেল। যখন তুমি কাঠগড়ায় দাঁড়াবে, জেরার উত্তর দিতে। ওনাস অব রেসপন্সিবিলিটি তোমার। প্রমাণ করা : রাকেশ ভার্মা তোমার বেনামদার নয়। প্রমাণ করা যে, বাড়িটা আটতলা গাঁথা হবে জেনেবুঝেই তুমি তোমার চারতলা বাড়ির প্ল্যানে একটা লিফ্ট-এর প্রভিশন করনি ! ওরা নানাভাবে তোমার চরিত্রহননের চেষ্টা করবে। প্রচুর অর্থ

বিনিয়োগ করে তোমার অতীত জীবনটা কঙ্কতিকা সম্মার্জনীর মাধ্যমে...

অলকা বলে, 'কঙ্কতিকা সম্মার্জনী' মানে?

অশোক বলে, আমি বুঝেছি, স্যার। আপনি প্রথম দিনই পরামর্শ দিয়েছিলেন আমি যেন মানহানির মোকদ্দমা দায়ের না করি।

—কারেক্ট! সেদিন তাই বলেছি, আজও তাই বলছি।

অশোক সক্ষোভে বলে, আমার ধারণা ছিল না, আদালতের বিচার একটা আদ্যন্ত প্রহসন।

বাসু ঝুঁকে পড়ে বলেন, তা তো আমি বলিনি, অশোক!

—বলেননি? আপনিই তো বলেছেন যে, মানহানির মামলায় গরিব বাদী জিতলেও তার হার অনিবার্য। তাকে বিনিময়ে সর্বস্বান্ত হতে হবে। আর্থিক ক্ষমতাবানের কাছে আদালত অসহায়...

—না, অশোক। সে-কথাও আমি বলিনি। তুমি—রাদার তোমরা দুজনে ঐ বইয়ের আটটা কেস পাঠ করে এ সিদ্ধান্তে এসেছ। এ তোমাদের সিদ্ধান্ত।

—আদালত সম্বন্ধে আপনার ধারণা সে-রকম নয়?

—নিশ্চয় নয়। কারণ আমার অভিজ্ঞতায় কয়েক শত মানহানির কেসহিস্ট্রি সঞ্চিত আছে— আটটি নয়। আদালত সম্বন্ধে এই মাত্র তুমি একটা অবমাননাকর কথা বলেছ, তাই আর একটি কেস-হিস্ট্রি শোনাই। ঐ মানহানির মামলারই। সেটাও ষাট-সত্তর বছর আগেকার ঘটনা। এই কলকাতা শহরেরই একটি ঐতিহাসিক মামলার বিবরণ।

তখন 'প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা' সগৌরবে প্রকাশিত হচ্ছে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ এবং কলকাতায় কাজীসাহেব আসীন। 'কল্লোল যুগের' প্রবাহে জোয়ার এসেছে। প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন বাংলাসাহিত্যের অতন্দ্র নৈশ প্রহরী— শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাস।

সে আমলে আদ্যন্ত আর্ট-প্লেটে ছাপা একটি শিল্পবিষয়ক আধা-সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হত কলকাতা থেকে, একজন জমিদার-তনয়ের অর্থানুকূল্যে। তিনি নিজেও প্রখ্যাত শিল্পী, শিল্পসমালোচক ও শিল্পসংকলক। তিনি পিছন থেকে পত্রিকাটিকে পরিচালনা করতেন। পত্রিকায় সম্পাদক হিসাবে ছাপা হত একজন মাহিনা-করা সাহিত্যিকের নাম। ঐ পত্রিকায় প্রায়ই নানান চাঞ্চল্যকর কেচ্ছা-জাতীয় সংবাদ প্রকাশিত হত। সেই সেই সংখ্যার বিক্রিও হত দারুণ। নানান পত্র-পত্রিকার সম্পাদকেরা বাদপ্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠতেন।

হঠাৎ আর্ট-জার্নালের একটি সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে আক্রমণ করা হল বঙ্কিমচন্দ্রকে। নানান যুক্তিতর্কে বঙ্কিমকে নস্যাৎ করার পৈশাচিক প্রচেষ্টা। বঙ্কিম নাকি ছিলেন সাম্প্রদায়িক। তিনি নাকি গোঁড়া হিন্দু। তাঁর রচনা আসলে অতি

নিকৃষ্ট। এমনকি, ব্যক্তিগত জীবনেও বাবু বঙ্কিম ছিলেন অসংযমী, অমিতাচারী! বাড়তে বাড়তে শেষদিকে একটা দারুণ চমক দেবার বাসনা চাগল লেখকের। তার পূর্বেই শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র হনন করে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। সরকার সেটি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন বটে কিন্তু 'হরিদাসের গুপ্তকথা'র মতো বাজারে তার একটা গোপন চাহিদা ছিল। 'চৈতন্যচরিতহলাহল' বইটি বাজেয়াপ্ত হলেও শোনা যায় লেখক খুব কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হননি। তাই এই লেখক—বস্তুত সম্পাদক নিজেই, ঐ দুঃসাহসিক পদক্ষেপ করে বসলেন। আন্দাজ করলেন, বাদ-প্রতিবাদে অন্যান্য কাগজ যতই মুখর হবে ওঁর ঐ সংখ্যার বিক্রি ততই বৃদ্ধি পাবে। শেষমেশ যদি সরকার ঐ সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করেন ততদিনে ওঁদের গুদাম সাবাড়।

সম্পাদক তাই প্রবন্ধের উপসংহারে লিখলেন, "আপনারা কি জানেন—সাহিত্যসম্রাটের একটি সুন্দরী যৌবনবতী রক্ষিতা ছিল? সপ্তাহান্তে বাবু বঙ্কিম তাঁর বাগানবাড়িতে রাত্রিবাস করতেন? যার অনিবার্য ফলস্বরূপ ঐ উপপত্নীর গর্ভে তাঁর একটি সন্তানও হয়েছিল?"

কী নিদারুণ কদর্য অভিযোগ!

হৈ হৈ পড়ে গেল বাংলা সাহিত্যে। এদিকে প্রবাসী-ভারতবর্ষ বিচিত্রা, ওদিকে কল্লোল কালিকলম বসল প্রতিবাদ লিখতে। সকলেরই সম্পাদকীয়র একই বিষয়বস্তু। একমাত্র ব্যতিক্রম সজনীকান্ত। যিনি সচরাচর এসব ব্যাপারে সবার আগে হুমড়ি খেয়ে পড়তেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যোগেশচন্দ্র বাগল দুই মহাপণ্ডিতই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পরবর্তী সংখ্যায় ঐ প্রবন্ধের যুক্তি খান্ খান্ করতে চাইলেন। সজনীকান্ত স্বীকৃত হলেন না।

তিনি আদালতে একটা মানহানির মোকদ্দমা দায়ের করলেন পরিবর্তে।

আবেদনে তিনি বলেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্য-সাহিত্যের জনক। ফলে বঙ্কিমের প্রতি নিক্ষিপ্ত ঐ কর্দমে সমগ্র বঙ্গ ভাষাভাষীর মানহানি হয়েছে। বঙ্গ-ভাষার সেবকদের তরফে তাই সজনীকান্ত মহামান্য আদালতে বিচারপ্রার্থী।

আদালত থেকে ঐ সংখ্যাটি বিক্রয় বন্ধের ইনজাংশন বের হবার আগেই বুদ্ধিমান সম্পাদক ওজনদরে সব অবিক্রিত সংখ্যা বিক্রয় করে দিয়েছেন।

ঘটনাচক্রে ছোট আদালতের ঐ বিচারক ছিলেন বাংলায় এম. এ.। বঙ্কিমভক্ত। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিচার শেষ করলেন তিনি। তার সেই রায়টি বিচার-বিভাগে একটি ঐতিহাসিক দলিল। প্রতিবাদী প্রমাণ করত পারলেননা যে, সাহিত্য-সম্রাটের একটি রক্ষিতা এবং/অথবা অবৈধ সন্তান ছিল। প্রবন্ধকার যখন জেরায় স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে নিজের কল্পনায় রঙ চড়িয়ে তথ্যটি তিনি প্রকাশ করেছেন, তখন বিচারক তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। এ পর্যন্ত প্রত্যাশিত ঘটনা। মামলার অবস্থা দেখে সবাই তা আন্দাজ করেছিল। কিন্তু বিচারক শাস্তির যে বিধান দিলেন তা অশ্রুতপূর্ব: এক লক্ষ টাকা জরিমানা!

অনাদায়ে পনেরো দিনের সশ্রম কারাদণ্ড !

স্তম্ভিত হয়ে গেল সবাই ! এ কী রে বাবা ! আর্থিক জরিমানার অঙ্কটা এক লক্ষ টাকা ! যেটা আজকের দিনে এক কোটি টাকার সামিল ! যেহেতু 'লাইবেল' -মামলায় ক্ষতিপূরণের উর্ধসীমা আইনে বেঁধে দেওয়া হয়নি ! আর এদিকে অনাদায়ে সশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদ মাত্র পনেরো দিন !

জমিদার তনয়—যাঁর অর্থানুকূল্যে কাগজটা প্রকাশিত হত—তিনি হাটকোর্টে আপীল করলেন। আপীলে মহামান্য হাটকোর্ট জরিমানার অঙ্কটা কমিয়ে দিলেন পঞ্চাশ হাজার টাকায়। কিন্তু সশ্রম কারাবাসের মেয়াদটা বাড়িয়ে দিলেন—অনাদায়ে একমাস সশ্রম কারাদণ্ড। উপরন্তু বাদীর তরফে মামলার খরচ পত্রিকাকে মিটিয়ে দেবার আদেশ দিলেন। রায়ে মহামান্য হাইকোর্ট যা বলেছিলেন তার চুম্বকসার : এক শ্রেণীর সুযোগসন্ধানী, যশোপ্রার্থী, বিবেকহীন লেখক সমপর্যায়ের নীতিজ্ঞানহীন সম্পাদকেব পৃষ্ঠপোষকতায় সজ্ঞানে বরেণ্য, সর্বজনশ্রদ্ধেয়, জাতীয় নেতাদের নামে কুৎসা রচনা করে থাকেন। তাঁরা হিসাব করে দেখেছেন, কুৎসা-কাহিনীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ সচরাচর আদালতের জরিমানার অঙ্ককে ছাপিয়ে যায়। এই প্রবণতাকে ঠেকানোর একমাত্র উপায় জরিমানার অঙ্কটা গগনস্পর্শী করে অপরাধীকে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগে বাধ্য করা। দুই একজন ঐ জাতীয় লেখক, যাঁরা রগরগে 'blasp hemous' রচনা লিখে কুখ্যাত হতে চান—তাঁরা জেল খেটে এলে এই প্রবণতাটা বন্ধ হবে। নিম্ন আদালতের বিচারক সম্ভবত সে জন্যই জরিমানার অঙ্কটা এক লক্ষ টাকা ধার্য করেছিলেন। অর্থাৎ বিবেকহীন লেখককে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগে বাধ্য করেছিলেন। পরন্তু তাঁর বয়সের কথা বিবেচনা করে মাত্র পনেরো দিনের মেয়াদ ধার্য করেছিলেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, অপবাধী শান্ত চিত্তে, অবনতমস্তকে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত নন। তিনি পুনর্বিচারের প্রত্যাশী। তাই মেয়াদ-কাল দ্বিগুণ করে দেওয়া হল।

ফলে সম্পাদকমশাই ডোরাকাটা হ্যাফপ্যান্ট পরে, গলায় তক্তি ঝুলিয়ে কপির চাবা বুনতে গেলেন প্রেসিডেন্সি জেল-এ। এরপর থেকে বাঙলা সাহিত্যে আর কোনও প্রাবন্ধিক গবেষণা করার অবকাশ পাননি—কোন্ কোন্ প্রয়াত মহাত্মার জারজ সন্তান ছিল বা আছে।

অশোক বললে, হায় রে কবে কেটে গেছে সজনীকান্তের কাল !

—একথা কেন বলছ অশোক ?— জানতে চাইলেন বাসু-সাহেব।

—আপনি জানেন কি না জানি না—ঐ প্রবণতাটা আবার দেখা যাচ্ছে বাঙলা সাহিত্যে। বিগত শতাব্দীর ঐতিহাসিক মহাত্মাদের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করে রচনাকে blasp hemous করার প্রবণতাটা। ঐ 'সঞ্জয় উবাচ' হৌসেরই একটি বহুল-বিক্রিত সাপ্তাহিকে একটি বহুল-বিকৃত ধারাবাহিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। আপনার মনে আছে নিশ্চয়, একটা চ্যাংড়া ছোঁড়ার কলমের খোঁচায়

লেঅনার্দো দ্য ভিঞ্চি ফ্লোরেন্স ত্যাগ করে মিলানে চলে গিয়েছিলেন, স্বেচ্ছা-নির্বাসনে। তাঁর বিরুদ্ধে সমকামিতার ঘৃণ্য অভিযোগ আনা হয়েছিল। এই ধারাবাহিক অনৈতিহাসিক উপন্যাসে অনুরূপ অভিযোগ আনা হল মাইকেল মধুসূদনের বিরুদ্ধে—গৌর বসাকের সঙ্গে মাইকেলের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের প্রসঙ্গে। শুধু সেখানেই থামেননি লেখক। ত্রৈলোক্যমোহিনী দেবীর দিকে কর্দম নিক্ষেপেও.....

—ত্রৈলোক্যমোহিনী দেবীটি কে?

—গত শতাব্দীর এক হতভাগিনী। তের বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। মাত্র পনের বছর বয়সে তিনি পুত্রবতী হন। জীবিতা ছিলেন তিরাশি বছর বয়স পর্যন্ত। প্রয়াত হন এই শতাব্দীর ১৯০৮ সালে। তিনি মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের সতী-সাধ্বী বালবিধবা জননী।

বাসু হেসে বললেন, না, অশোক, হিসেবে ভুল হল তোমার। সজনীকান্তের সেই ঐতিহাসিক কেস-এর প্রভাব আজও কথা-সাহিত্যেকেরা নতমস্তকে মেনে চলেন। রগরগে উপন্যাস লেখার বাসনা চাগলে,রচনায় নাম-ধামগুলি বদলে রাখেন। কারণ লেখক জানেন, না হলে হাফপ্যান্ট পরে, গলায় তক্তি ঝুলিয়ে কপি বুনতে যেতে হতে পারে।

অশোক বলে, সে যাই হোক, মোদ্দা কী দাঁড়ালো?

—সেটা তুমি স্থির করবে। তবে তার আগে আমি তোমাকে একটা বই পড়তে বলব—

ড্রয়াব থেকে একটি বই টেনে বার করেন।

—আবার বই?

—হ্যাঁ, আবার বই। একটা ছোট গল্পের সংকলন। লেখক: ফ্রেডেরিক ফরসাইথ। নামটা শুনেছ?

—'দ্য ডে অব দ্য জ্যাকল' কি এঁরই লেখা?

—কারেক্ট! শর্ট-স্টোরি কলেকশান। নাম: ''নো কামব্যাকস্!'' দশটি কাহিনী। প্রত্যেকটি কাহিনীই অসাধারণ। খোল-নলচে বদলে প্রত্যেকটি গল্পই বাঙলায় অনুবাদ করতে ইচ্ছে করে 'ঝিন্দের বন্দী'র মতো। সপ্তম গল্পটা পড়ে তার পর সিদ্ধান্ত নিও: ''প্রিভিলেজ''।

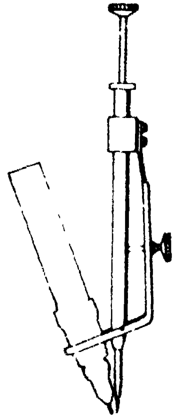

বাজারে ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে গেল সরোজবাবুর সঙ্গে।

সরোজমোহন কাঞ্জিলাল। অশোকের প্রতিবেশী। ঠিক পরের বাড়িটাই ওঁদের। সত্তরের উপর বয়স। কিন্তু মেরুদণ্ড সোজা করে হাঁটেন আজও। 'স্বাধীনতা সংগ্রামী' হিসাবে পেনশান পান। তাম্রপত্রও পেয়েছেন একখানি। এককালে খদ্দর ছাড়া পরতেন না। দেশ স্বাধীন হবার পর অবশ্য সে বাতিক আর নেই। এখন তো মিলের কাপড়ও স্বদেশী। ম্যাঞ্চেস্টার থেকে তো জাহাজে করে আসে না।

পাড়ার একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।

হাতে ভারী বাজারের থলি থাকায় অশোক যোড়হস্তে নমস্কার করতে পারল না। বললে, ভাল আছেন তো কাকাবাবু?

সরোজ কাঞ্জিলাল থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন মাঝ-সড়কে। ভ্রূকুটি করে ওর দিকে তাকিয়ে দেখলেন দশ সেকেন্ড। তারপর বললেন, আমি তো ভালোই আছি; কিন্তু তুমি কেমন আছ বল তো, অশোক?

— আজ্ঞে ভালই আছি, মানে এ বাজারে যতটা ভালো থাকা সম্ভব।

—তোমার সেই ঝামেলাটা মিটেছে?

—ঝামেলা? আজ্ঞে না। কোন ঝামেলাতে তো জড়িয়ে পড়িনি ইতিমধ্যে।

বৃদ্ধ ওর বাহুমূল ধরে একটু আড়ালে সরে এলেন। নিম্নস্বরে বললেন, আমি সবই খবর রাখি, অশোক। কাগজে তোমার নামে যা কেচ্ছা ছেপেছে তাও জানি, আবার তা যে আদ্যন্ত ভুল খবর সে খবরও রাখি।

অশোক বলে, ফলে আপনি জানেন যে, কোন ঝামেলায় আমি পড়িনি। সবটাই ভুল খবর।

— তার মানে তুমি এটা মেনে নিচ্ছ? প্রতিবাদ করবে না।

— কীসের প্রতিবাদ?

—অন্যায়ের।

বাজারের মাঝখানে এ নিয়ে বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা ওর আদৌ ছিল না। বললে, আপনার বাড়িতে গিয়ে একদিন না হয় ও নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

— না, একদিন নয়। আজই। দেখ অশোক। এভাবে অন্যায়েব সঙ্গে আপোস করা উচিত নয়। তোমাদের জেনারেশনের এই এক দোষ। সব সময়েই কম্প্রোমাইজ। টু ফলো দ্য লীস্ট পাথ অব রেজিস্টান্স! আমরা নেতাজীর আদর্শে মানুষ হয়েছি। আমরা আপসহীন সংগ্রামে বিশ্বাসী।

অশোক বাজারের মধ্যে ওঁকে বলল না, বৃদ্ধও প্রতিনিয়ত অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করে চলেছেন। জ্ঞাতসাবে এবং অজ্ঞাতসারে। ওঁর বড় ছেলে আমেরিকায় আছে আজ দশ বছর। তার র‍্যাশনে বৃদ্ধ হপ্তায় হপ্তায় চিনি তুলছেন না? মেজ ছেলে নাম করা কোম্পানিব পারচেজ অফিসার। তার অবস্থা থেকে উনি কি বুঝতে পাবেন না যে, শুধুমাত্র মাহিনায় এতটা রবরবা সম্ভবপর নয়? সে-সব প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলল, ঠিক আছে। আজই সন্ধ্যায় যাব আপনাব বাড়িতে।

—এস। বৌমাকেও নিয়ে এস। ব্যাপারটা বিস্তাবিত আলোচনা কবতে চাই তোমাদের সঙ্গে। কী জান অশোক, রাস্তাব মধ্যে কলাব খোসায় কেউ পা পিছলে পড়লে পথ-চলতি মানুষই তাকে টেনে তোলে।

ত. অশোক কথা রেখেছে। সস্ত্রীক না হলেও একাই গিয়ে হাজিরা দিয়েছে কাঞ্জিলাল মশায়েব বৈঠকখানায়। অলকাকে নিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। মিঠুনের হোমটাস্ক এখনো শেষ হয়নি।

বৃদ্ধ ওকে আপ্যায়ন করে বসালেন। বৌমা আসতে পারেননি বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন। তবে হেতুটা যে অপ্রতিবোধ্য তাও স্বীকার করলেন। ওঁর মেজ নাতিটা মিঠুনের সহপাঠী। অশোক জানে, সেই মেজনাতিটি ছাত্র ভাল নয়। তাকে ভর্তি করাবার সময় তার পার্চেজ অফিসার পিতৃদেবকে মোটা রকম ডোনেশন দিয়ে হয়েছে। আপোসহীন স্বাধীনতা সংগ্রামী তস্যপিতার অজ্ঞাতসাবে নয় নিশ্চয।

সরোজমোহন বললেন, তুমি কী স্থির করলে? এ ভাবে অপ্রতিবাদে সব অভিযোগ মেনে নেবে?

অশোক বুঝিয়ে বলাব চেষ্টা করে, তাছাড়া কী কবতে পাবি বলুন? আমার এক মেসোশ্বশুর আছেন— নামকরা ব্যাবিস্টার....

— জানি জানি, পি.কে. বাসু। তিনি কী বললেন?

—তিনি বললেন, প্রভাব আর প্রতিপত্তিশালী সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করে লাভ নেই। বহু উদাহরণ উনি দেখালেন। দুর্বল পক্ষ মামলায় জিতলেও সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। তাছাড়া আপনার বৌমা বলে, আমাদের চেনা-জানা সবাই প্রায় এতদিনে জেনে গেছে খববটা ভুল। আমাকে পুলিসে খুঁজছে না। আমার

প্ল্যানে বাড়ি তৈরী হচ্ছিল না। আমার কোন দোষই নেই। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে প্রথমে কিছুটা লোকসান হলেও এখন সবাই সত্যিকথাটা জেনে গেছে। আমার আর্থিক ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। এখন আর নতুন করে কিছু হচ্ছে না।

বৃদ্ধ ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, এই তোমাদেব দোষ অশোক। সব কিছুই 'আর্থিক বিচারে' দেখবে। 'আদর্শের বিচারে' কোন কিছুই জীবনে দেখবে না?

—আপনি কী করতে বলেন? মানহানির মামলা?

— সেটা তো শেষ পদক্ষেপ— লাস্ট স্টেপ! তাব আগে একটা প্রতিবাদ-পত্র লেখ। সম্পাদকীয় স্তম্ভে : লেটার্স টু দ্য এডিটার।

অশোক জানালো না যে, তেমন চিঠি লেখা হয়েছে এবং তার জবাবও এসে গেছে। বরং বললে, ধরুন আমি লিখলাম, ওবা তা ছাপালো না। তখন?

— তখন তুমি উকিলের চিঠি দেবে, প্লিডার্স নোটিস, তোমাব প্রতিবাদপত্র না ছাপালে তুমি হেভি কম্পেনসেশন ক্লেম কববে বলে ভয় দেখাবে...

— তার মানে, সেই মানহানিব মকদ্দমাব পথেই তো যেতে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত? কিন্তু 'সঞ্জয় উবাচ'-র মতো নামকবা কাগজের কোটিপতি মালিকের বিরুদ্ধে আমাব মতো ক্ষুদ্র মানুষ কী মামলা লড়বে?

বৃদ্ধ আবাব হতাশার ভঙ্গি করে বলেন, তোমার নিজের উপরেই কোন ভরসা নেই। তুমি কী করে লড়বে?

অশোকের মনে হল ডিফেন্সে খেলে এখানে কোন লাভ নেই। এ বৃদ্ধকে ঠাণ্ডা করতে হলে ওকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে অগ্রসর হতে হবে। তাই বললে, এক কাজ করুন না, কাকাবাবু। আপনিই একটা প্রতিবাদপত্র লিখে পাঠিয়ে দিন—

— আমি! আমি কী লিখব? আমি তো অফেন্ডেড পার্টি নই?

— না, তা নয়। আপনি লিখতে পাবেন যে, অশোক মুখুজ্জে ঠিক আপনার পাশের বাড়িতেই থাকে। আপনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানেন যে, ঘটনাব রাত্রিতে অশোক মুখুজ্জে আপনার পাশের বাড়িতেই ঘুমাচ্ছিল এবং এ পাড়ায় কোনও পুলিস রেড হয়নি। আপনি একজন নামকরা দেশসেবক। স্বাধীনতা সংগামী। আপনাকে সবাই চেনে, আপনার প্রতিবাদপত্র ওরা না ছেপে পারবে না।

বৃদ্ধ হাসতে হাসতে বলেন, লড়তে গেলে নিজের হিম্মতেই লড়তে হয়, অশোক! নেতাজী তাই শিখিয়ে গেছেন। ও ভাবে পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে লড়া যায় না।

— আপনিই বাজারে বলছিলেন না যে, কলার খোসায় পা পিছলে কেউ পড়ে গেলে পথ-চলতি মানুষই তাকে টেনে তোলে। তাই ও কথাটা বলছিলাম। তা আপনার যদি অসুবিধা থাকে তবে থাক।

— না অসুবিধা কিছুই নেই। তবে আমার অমন প্রতিবাদপত্রে কিছুই কাজ হবে না। পাঠক ভাববে, উনি বুড়ো মানুষ। তাই টের পাননি। পাশের বাড়িতে

পুলিস রেড হল কি হল না তা উনি জানবেন কেমন করে ?

— তা বটে। তবে থাক!

ঠিক একই প্রশ্ন করল দুদিন পরে ওর বন্ধু সিতাংশু চৌধুরী : তুই কী স্থির করলি ?

— আমি তো কিছু স্থির করার স্কোপই পেলাম না। অর্ধেকটা ঠিক করল অলকা। বাকি অর্ধেকটা তার মেসো। সবাই মিলে আমাকে বোঝালো : গরিবের মানহানি হয় না। কারণ সুকুমার রায় বলে গেছেন প্রতিপত্তিশালী ধনকুবেরের কাছে মধ্যবিত্ত ও গরিবের মান মানে কচু।

সিতাংশু ওর দীর্ঘদিনের বন্ধু। স্কুলজীবন থেকে। সত্যিই ভালবাসে অশোককে। বললে ? ধর যদি অলকা আর মেসো না থাকত। তাহলে তুই কী করতিস ?

—এমন অ্যাবসার্ড হাইপথেসিস ধরে নিলে কী জবাব দেব ?

—অ্যাবসার্ড হাইপথেসিস বলছিস কাকে ?

— অলকা নেই। আমি আছি, এটা ধারণাই করতে পারি না।

— ওরে ব্বাবা! এত! আমি বলছি, ধর তুই এখনো বিয়েই করিসনি। তাহলে কী করতিস ?

অশোক একটু চিন্তা করে বললে, ঠিক জানি না রে।

— আমি জানি!

— তুই জানিস, আমি কী করতাম তাহলে ?

—হ্যাঁ জানি ?

— কী বল ?

—তুই নিচের তলা থেকে শুরু করছিস। ঐ রিপোর্টার, নাহলে তার বস, না হলে নিউজ এডিটার কারও না কারও নাকে দ্রাম করে একটা ঘুষি বসিয়ে দিতিস।

—ঘুষি! তুই কি ভাবিস আমি এখনো ছেলেমানুষ ?

—না! কিন্তু তুই কলেজে থাকতে একবার মিডল ওয়েট চাম্পিয়ান হয়েছিলি। বক্সিংটা তোর রক্তে। এখানে সেই সেন্সেই ‘ঘুসি’ কথাটা বলেছি। দৈহিক ঘুষির কথা নয়।

— না, সিতাংশু! ‘মানসিক ঘুষি’ কী ভাবে মারা যায় — তা আমি আদৌ জানি না।

— আমি একটা পরামর্শ দেব ?

একটা ছেড়ে দশটা পরামর্শই দে না। কে বারণ করেছে?

-- তুই আমার সঙ্গে একবার বড়মামার কাছে চল।

— তোর বড়মামা? মানে ঐ মহিম হালদার? তিনি তো এ তল্লাটের এম.এল.এ. নন?

— তল্লাট আবার কী? অঙ্গাঙ্গিভাবমগত্ত্বা কথং সার্মথ্য নির্ণয়..

—ওরে বাবা! তুই যে 'সমোসকৃত' আওড়াতে শুরু করলি রে সিতাংশু! ঐ মন্তরটার অন্বয় ব্যাখ্যা কী?

— মন্ত্র নয়। পঞ্চতন্ত্রের কথা। কার সঙ্গে কার আঁতাত আছে তা কি তুই জানিস? মহিম হালদার একজন জাঁদরেল বিধায়ক।

— তা জানি। কিন্তু আমার যতদূর বিশ্বাস ওর সঙ্গে 'সঞ্জয় উবাচ' পত্রিকার সদ্ভাব নেই। মানে পার্টিতুতো সম্পর্কে থাকার কথা নয়।

সিতাংশু ওকে বোঝাতে থাকে, ইদানীং কালের রাজনীতি অত সহজে বোঝা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় অমুক কাগজ অমুক পার্টির স্বপক্ষে বা বিপক্ষে। কিন্তু বিপক্ষ-শিবিরের মধ্যেও আঁতাত থাকে, যেমন থাকে স্বপক্ষ শিবিরেও সাপে-নেউলের সম্পর্ক। তুই আমার সঙ্গে চল। বড়মামা আমাকে খুবই ভালবাসে। আমি কেস নিয়ে গেলে না করতে পারবে না। যাহোক একটা মতলব বাৎলে দেবে। আর ধর যদি তা না-ই হয় তোর ক্ষতিটা কী? বল?

অগত্যা অশোক রাজি হয়ে যায়।

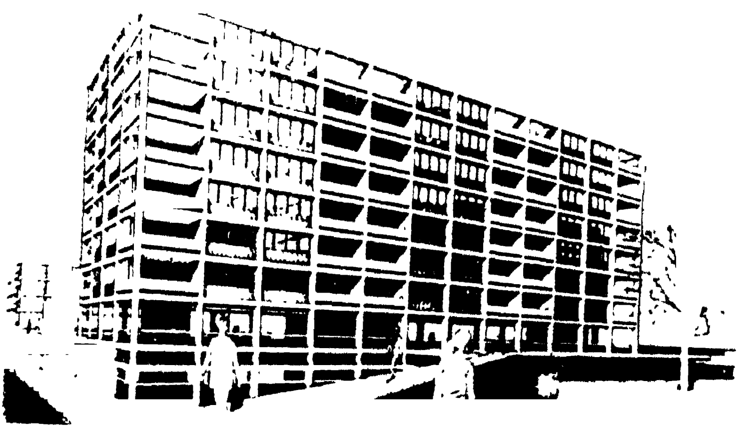

আদ্যন্ত কেসটা শুনে মহিম হালদার বললেন, তুমি গোড়ায় গলদ করে বসে আছ অশোক। ... তোমাকে তুমিই বলছি ভাই, কিছু মনে কর না। তুমি সিতাংশুর বন্ধু...

অশোক সায় দেয়, তাই তো বলবেন বড়মামা! আপনি বয়সেও কত বড়। এলাকার একজন মানী লোক।

মনে মনে অবশ্য যোগ করে— মানী কিনা, সেটা অবশ্য বির্তকের বিষয়। অর্থাৎ বর্তমান সমাজব্যবস্থায় মান মানে যখন কচু। তবে মহিম হালদার নিঃসন্দেহে একজন ভি.আই.পি.। অশোকের যাদবপুর এলাকার না হলেও পার্শ্ববর্তী এলাকার এম.এল.এ.। পর পর দুবার। সিতাংশুই নিজের ফিয়াটে অশোককে নিয়ে এসেছে মামার কাছে। তাঁর চেম্বারে একান্ত সাক্ষাতে। খাতা-কলমে এবং অ্যাসেম্বলির বিবরণীতে ওঁর নাম মহিম লেখা হলেও নিজ এলাকায় মহিমান্বিত মহিমবাবু অন্য এক নামে পরিচিত: ঝানু হলদার।

ওঁর ক্যাডার বাহিনী সগর্বে বলে স্ট্যান্ডিং এম.এল.এ. তো কয়েক শ, কিন্তু লাইং এম.এল.এ. মাত্র একজনই— আমাদের ঝানুদা। বিছানায় শুয়ে শুয়েই ইলেকশান জেতেন প্রতিবার। কেন জিতবেন না? আমাদের মতো দক্ষ ক্যাডার বাহিনী আছে আর কোন এলেবেলের?

বিরুদ্ধবাদী দলের ক্যাডার বাহিনী বলে, লাইয়িং এম.এল.এ. তো বটেই। জীবনে একটাও সত্যি কথা বের হয়নি ঝানু হালদারের পোড়া মুখ দিয়ে—

— যে কথা বলছিলাম অশোক। তুমি গোড়ায় গলদ করে বসে আছ। প্রথমেই প্লীডার্স নোটিস দেওয়াটা ঠিক হয়নি। 'সঞ্জয় উবাচ' যদিও আমাদের বিরুদ্ধ দলের কাগজ, উঠতে-বসতে আমাদের খিস্তি করে— তবু ওর এডিটার ভদ্রলোক। কমরেড না হলেও। তুমি যদি উকিলের চিঠি না দিয়ে স্বয়ং গিয়ে দেখা করতে তাহলে ওরা নিশ্চয় সংশোধনী সংবাদটা ছেপে দিত। উকিলের চিঠি দেওয়ায় একটা প্রেস্টিজ ইস্যু দাঁড়িয়ে গেছে।

সিতাংশু বলে, তাই তো আপনার কাছে ছুটে এলাম, বড়মামা। এখন কী করা যায় বলুন ?

— প্লীডার্স নোটিসটা উইথড্র করনো যাবে ?

সিতাংশু অশোকের দিকে তাকায়। অশোক বলে, বাসু-সাহেবও একজন মানী লোক। সম্পর্কে আমার মেসোশ্বশুর। ইন ফ্যাক্ট, আমাদের অনুরোধই তিনি চিঠিখানা লিখেছিলেন। এখন...

— বুঝেছি। ঐ চিঠিখানা উইথড্র করানো গেলে না হয় রিকোয়েস্ট করে দেখতাম.. যদিও রাজনৈতিক আদর্শবাদের দিক থেকে আমরা বিপরীত মেরুর বাসিন্দা— ওরা কায়েমী স্বার্থ দেখে, আমরা জনগণের, তবু হয়তো আমার অনুরোধটা ওরা রাখত। কিন্তু উকিলের নোটিসটা থাকায় সেটা সম্ভবপর হচ্ছে না।

— এক্ষেত্রে কী পরামর্শ দেন ?

— আমার তো মনে হচ্ছে একমাত্র সল্যুশান আমাদের পার্টি-পেপারে সানডে সেকশানে একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করা। সেভেন্থ জুন আমাদের কাগজেও খবরটা প্রকাশ হয়েছে। সেখানে আর্কিটেক্ট এর নাম বলা হয়নি। লোকের উৎসাহও এই পক্ষকালের মধ্যে ঝিমিয়ে এসেছে। তবু অশোক যদি চায় তাহলে রবিবারে ঐ ভাঙা-বাড়ির ফটো-টটো দিয়ে একটা বড়ো প্রবন্ধ ছাপানো যায়। কর্পোরেশনের সৎ অফিসারদের কী ভাবে বিপদে ফেলছে একজাতের অসৎ লাইসেন্সড আর্কিটেক্ট অ্যান্ড...

অশোকের অবাক দৃষ্টি লক্ষ্য করে উনি বলে ওঠেন, না হে তোমার কথা বলছি না। রাকেশ ভার্মা! ঐ ছুতোয় আমাদের প্রাবন্ধিক 'সঞ্জয়' কেও একহাত নেবে। 'সঞ্জয় উবাচ' ভ্রান্ত সংবাদ পরিবেশন করেছিল— পুলিসে রেইড করল রাকেশ ভার্মার বাড়ি, আর ওরা ছাপল অশোক মুখার্জীর নাম...

সিতাংশু বলে, আপনি চাইলেই সম্পাদক সানডে সেকশানে...

ঝানু হালদার মৃদু হাসলেন। বাহুল্য জবাব দেওয়ার বদলে এক খিলি পান মুখে দিলেন। পকেটে সিগ্রেটের প্যাকেট খুঁজলেন। না পেয়ে একটা বড় নোট বার করে সিতাংশুর দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, এক প্যাকেট ইন্ডিয়া কিং নিয়ে আয় তো সিতাংশু। চাকরটা বাজারে গেছে।

সিতাংশু নোটটা নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া মাত্র ঝানু হালদার ঝুঁকে পড়েন অশোকের দিকে, কী? সানডে-সেকশানে বহুতল বাড়ির কেলেঙ্কারি নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখে তোমার বক্তব্যটা ছেপে দিলে কি তোমার সমস্যার সমাধান হয় ? তুমি জান— আমাদের পার্টি-পেপারের বিক্রি এখন 'সঞ্জয় উবাচ'র ডবল ?

অশোক ঢোক গেলে। কী বলতে পারে সে ? তার ধারণায় 'সঞ্জয় উবাচ' দৈনিক পত্রিকা ওঁর পার্টির মুখপত্রের দ্বিগুণ বিক্রি হয়, হয়তো তিন গুণ। কিন্তু

সে কথা তো মুখের উপর বলা চলে না। তাই হাসি-হাসি মুখে বলে, তাহলে তো আর কোন সমস্যাই থাকে না।

— কিন্তু একটা কথা, অশোক। এসব ব্যাপার মৌফৎসে হয় না। পার্টি ফান্ডে তোমাকে কিছু কনট্রিবিউট করতে হবে।

আবার ঢোক গিলে অশোক বলে, কত ?

—সেভেন গ্র্যান্ড। আমি অবশ্য ছাপানো রসিদ দেব।

অশোক সসঙ্কোচে বলে, না না রসিদ কী হবে ?

—যেহেতু তুমি ক্যাশ দিচ্ছ, চেক-এ নয়।

—ক্যাশ ?

অবশ্য ক্যাশ বা চেক-এর কোনও পার্থক্য নেই। এতো আর ইনকাম ট্যাক্সে এক্সপেন্স অ্যাকাউন্টে দেখানো চলবে না। ফলে রসিদও নিরর্থক। অশোক বলে, আচ্ছা একটু ভেবে দেখি মামা। টাকাটাও তো জোগাড় করতে হবে।

— না হয় ফাইভই দিও। এসব ব্যাপাবে যত দেরী করবে ততই ব্যবসায়িক লোকসান। বিশেষ তুমি সিতুর বন্ধু।

— তা তো বটেই।

এই সময়েই সিতাংশু ইন্ডিয়া কিং নিয়ে ফিরে এল।

অশোক মনে মনে হাসে। ইন্ডিয়ান কিংস্‌দের উচ্ছেদকারী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল রাজীব গান্ধী নিহত হবার সুযোগে মৌর্য অশোক এবং মোঘল আকবরের আগেই তড়িঘড়ি ভারতরত্ন হলেন— কিন্তু ইন্ডিয়া কিং এবং ইন্ডিয়া কিংসরা আজও রাজত্ব করে চলেছেন।

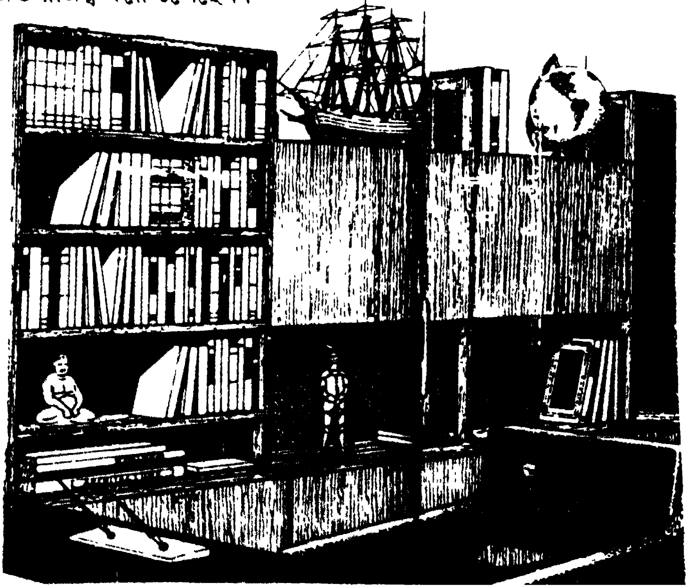

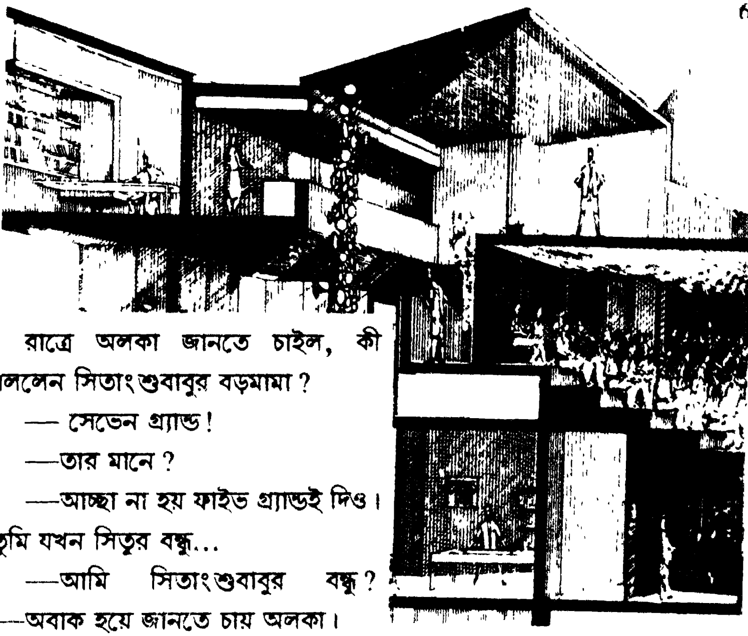

রাত্রে অলকা জানতে চাইল, কী বললেন সিতাংশুবাবুর বড়মামা?

— সেভেন গ্র্যান্ড!

—তার মানে?

—আচ্ছা না হয় ফাইভ গ্র্যান্ডই দিও। তুমি যখন সিতুর বন্ধু...

—আমি সিতাংশুবাবুর বন্ধু? —অবাক হয়ে জানতে চায় অলকা।

অশোক জবাব দেয় না। এক দৃষ্টে ঘূর্ণমান ইলেকট্রিক ফ্যানটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

ইতিমধ্যে কলকাতায় মনসুন নেমেছে। বাইরে বর্ষণ চলেছে একটানা। মিঠুন ঘুমিয়ে কাদা। জবাব না পেয়ে অলকা পুনরায় জানতে চায়, আর তাছাড়া গ্র্যান্ড মানে কী?

—মার্কিন থ্রিলারে তার মানে হাজার ডলার। আমরা আদার ব্যাপারী— তাই আমাদের কাছে হাজার টাকা।

—কী বলছ কিছুই বুঝছি না।

অশোক উঠে বসে। একটা চারমিনার ধরায়। বলে, শোন তবে আদ্যোপান্ত ঝানু হালদারের কেচ্ছা।

অলকা বালিশটা বগলের তলায় টেনে নিয়ে আধশোয়া হয়। চাদরটা টেনে দেয় মিঠুনের গায়ে।

বলে, বল?

গল্পও শেষ হল লোডশেডিংও শুরু হল। পাখা বন্ধ. আলো গেল। অ্যাশট্রের গর্ভে স্টাম্পটাকে ঠেশে ধরে অশোক, বলে কী করতে ইচ্ছে করে বলতো? খুন, জখম না আত্মহত্যা?

অন্ধকারের মধ্যে অলকাকে দেখা যায় না। গরমের হাত এড়াতে লোডশেডিং-এর কল্যাণে সে ব্লাউস খুলতে ব্যস্ত। বললে আমার তো গান গাইতে ইচ্ছা করছে।

—গান! এই নিদারুণ পরিস্থিতিতে গান? তুমি কি হিন্দি ফিল্মের নায়িকা

হয়ে গেলে টি.ভি দেখতে দেখতে? কী গান?

—'তিন পয়সার পালা'র। অজিতেশের দারুণ গানটা। শোন: সুরেলা কণ্ঠে অলকা গেয়ে ওঠে:

''ইচ্ছে করলে হাঙরেরও দাঁত দেখতে পাবে
কিন্তু যখন মহিমবাবুর ছুরিটি চমকাবে
তখন দেখতে পাবে না, তখন দেখতে পাবে না।।''

সমস্যা হয়েছে মিঠুনকে নিয়ে। সে যে কী শুনেছে, কী বুঝেছে তা বোঝা যায় না। কিন্তু ঐ ছোট্ট মানুষটার অন্তরেও অজানা ভূমিকম্পে কী যেন সব ওলট পালট হয়ে গেছে। একদিন সে তার মাকে শুধু প্রশ্ন করেছিল, মা আমি ঘুমিয়ে পড়ার পর কি একদিন রাত্রে পুলিস এসেছিল আমাদের বাড়িতে?

—পুলিস? না তো? পুলিস আসবে কেন?

—বাপিকে ধরতে?

—কে বলেছে এসব কথা?

মিঠুন স্বীকার করেনি।

অশোক সে কথা শুনে বলেছিল, যখন কিছুটা শুনেছে তখন সবটাই ওকে শোনানো দরকার। ও নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মতো যেটুকু পারে বুঝে নিক। অন্তত এটুকু সে নিশ্চয় বুঝতে পারবে যে, তার বাপি কোনও অন্যায় কাজ করেনি। সে পুলিসের চোখে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াচ্ছে না।

মিঠুনকে ডেকে তাই ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছিল। অসীম আগ্রহ নিয়ে মিঠুন বুঝবার চেষ্টা করেছিল।

ওর নিজের সমস্যা প্রায় এই একমাসের মাথাতেও শেষ হয়নি।

এখনও পথেঘাটে অবাঞ্ছনীয় নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

—কী মুখার্জী সাহেব? আপনার সেই পুলিস কেস মিটল?

—সন্দীপ ধনপতিয়া আর আপনার সঙ্গে এখন যোগাযোগ রাখে না? সে তো এখনো আন্ডারগ্রাউন্ডে, নয়?

কেউ হয় তো আগবাড়িয়ে বলে, সে রাত্রে কী করে কেটে পড়লেন মশাই? শুনেছি রেইড হয়েছিল রাত বারোটায়? তারপর অ্যান্টিসিপেটারি বেইল পেলেন কবে?

অলকাকে কথা দেওয়া আছে। অশোক মেজাজ খারাপ করবে না। করেও না। ধীর-স্থির ভাবে সে সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে যায়।

আজ্ঞে না, আমার বিরুদ্ধে কোন পুলিস-কেস নেই, তাই মেটামেটির প্রশ্নই ওঠেনা।

আজ্ঞে না সন্দীপ ধনপতিয়ার সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই।

আজ্ঞে ওটা ভুল শুনেছেন, সে রাত্রে আমার বাড়ি আদৌ রেইড হয়নি।

একবার — শুধু একবার সে মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি। হেতুটা সহজবোধ্য। প্রশ্নকর্তা জেনেবুঝে ন্যাকা সেজে ছিল :

ঘটনাটা সিটি আর্কিটেক্টের ঘরে। অন্য একটা প্ল্যানের অবজেকশান মিটিং। ঘরে সাত-আটজন। হঠাৎ সিটি আর্কিটেক্টের ফরমায়েসে সাত-আট কাপ চা এল। মিটিং এর মাঝখানে বিরতি পড়ল। সিটি আর্কিটেক্ট বড়াল-সাহেব হঠাৎ অশোকের কাছে জানতে চাইলেন, সন্দীপ ধনপতিয়ার কোন পাত্তা পাননি আর? কী বলছেন মিস্টার মুখার্জী?

—না তো। শুনেছি সে আন্ডার-গ্রাউন্ডে আছে। পুলিসে তার খোঁজ পাচ্ছে না। আপনি তার পাত্তা জানেন না কি?

অর্থাৎ বলটা সে ও কোর্টে ফিরিয়ে দিল। ঘরে উপস্থিত আটজনই জানে যে, সন্দীপ ধনপতিয়াকে পুলিসে খুঁজছে। সে কোথায় আছে তা যদি কেউ জানে ও গোপন করে, তবে সে অপরাধী। বড়াল-সাহেবের অভিযোগটা সে তাই ঐ ভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিল। ভেবেছিল, ওখানেই খেলা শেষ হবে। হল না। বড়াল আবার একটা নতুন জোরালো সার্ভ করল : যাই বলুন মুখার্জী সাহেব, চারতলা বাড়িতে লিফটের প্রভিশন রাখাটা আদালত সুনজরে দেখবে না। বলবে, ওটা আপনার মোটিভেটেড অ্যাটেম্পট।

অশোক একটি চারমিনার ধরিয়ে বলে, কেন? তিন বা চার-তলা বাড়িতে লিফট বানানো তো বেআইনি নয়। আপত্তির কিছু আছে?

—তা নেই। তবে মামলা যদি আদালতে যায় তাহলে এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আর্কিটেক্ট চারতলা বাড়িতে লিফটের প্রভিশন্স রাখল কেন? আইন যাই বলুক, আসলে সে কি জানত চারতলা প্ল্যান স্যাংশন্ড হলেও ধনপতিয়া গোপনে আটতলা বানাবে?

অশোক এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে হাসতে হাসতে বলেছিল, মামলা যদি আদালতে যায় তাহলে এ প্রশ্নও তো উঠতে পারে স্যার, যে সিটি আর্কিটেক্ট চারতলা বাড়িতে লিফটের প্রভিশন্স রাখতে দিলেন কেন? আইন যাই বলুক, তিনি কি জানতেন যে চারতলা প্ল্যান স্যাংশন্ড হলেও ধনপতিয়া গোপনে আটতলাই বানাবে?

সেদিন ওর প্ল্যানটা নানান খুঁটিনাটি কারণে আটকে গেল।

তবু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল। একেবারে বিপর্যয়-কাণ্ড ঘটে গেল যেদিন মিঠুন মাথা ফাটিয়ে ফিরে এল স্কুল থেকে। সিনিয়ার কয়েকটা ছেলের সঙ্গে মিঠুন মারামারি করেছে। তারা দলে ছিল ভারী। দু-একজনের জামা-কাপড় ছিঁড়েছে, আঁচড়-কামড় লেগেছে। কিন্তু মিঠুনের কপাল রীতিমতো কেটে গেছে। স্টিচ দিতে হয়েছে দুটো। স্কুল থেকে একজন মাস্টারমশাই আর ওর ক্লাসের কয়েকটি ছেলে ট্যাক্সি করে মিঠুনকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেল। অশোক তখন বাড়ি ছিল না। যে মাস্টার-মশাই

পৌঁছে দিতে এসেছিলেন তিনি জানিয়ে গেলেন ভয়ের কিছু নেই। ইঞ্জেকশান দেওয়া হয়েছে। ওর এখন বিশ্রাম দরকার শুধু। কী নিয়ে বচসা তা তিনি ভাঙলেন না। ওর সহপাঠীরা অলকার পীড়াপীড়িতেও তা স্বীকার করল না।

মিঠুন কোন কথা বলল না। কাঁদল না পর্যন্ত।

অশোক বাড়ি এসে সব বৃত্তান্ত শুনল। মিঠুনকে আদর করল। টিনটিন পড়ে শোনাল ; কিন্তু একবারও জানতে চাইল না : কী নিয়ে বচসা।

সেটা ও বুঝতে পেরেছে।

পরদিন অশোক ফোন করল 'সঞ্জয় উবাচ' হৌসে। রিসেপশানিস্ট আরতি মিত্রকে চাইল। একটু পরেই যোগাযোগ হল। সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে দিয়ে বলল, আপনি আমার একটা উপকার করবেন, মিসেস মিত্র ?

— বলুন ?

—আমি আর সহ্য করতে পারছি না। একমাত্র সল্যুশান : মিস্টার দাশশর্মাকে সব কিছু খুলে বলা। কিন্তু আপনাদের দুর্গে আমার পক্ষে প্রবেশ করা অসম্ভব। ব্যূহমুখে স্বয়ং জয়দ্রথের ভূমিকায় ভৈরববাবু আসীন !

—দেয়ারফোর ?

—আপনি কাইন্ডলি শচীন দাশশর্মার হোম অ্যাড্রেসটা আমাকে গোপনে জানিয়ে দেবেন ?

—হোম অ্যাড্রেস না টেলিফোন নাম্বার ?

—দুটোই। নাম্বার এবং অ্যাড্রেস। ফোন করলে হয়তো উনি শুনতে চাইবেন না।

—অল রাইট। লাইনটা ধরে থাকুন। খুঁজে নিয়ে জানাতে আমার একটু সময় লাগবে।

বেশি সময় লাগল না কিন্তু। অশোক লিখে নিল।

পরদিন অফিস কামাই করল অশোক। সারাটা দিন মিঠুনের সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে দিল। পাড়ার ভি.ডি.ও. পার্লার থেকে ওয়াল্ট ডিজনের একটা ক্যাসেট নিয়ে এসে ভি.ডি.ও. চালিয়ে শুনল। অনেকক্ষণ টিনটিন পড়ল আর জিগ্‌স পাজ্‌ল করা হল। ঝেঁপে বর্ষা নেমেছে। বাজার-হাট হল না। অলকা খিচুড়ি চাপিয়েছে। তার গন্ধ ভেসে আসছে।

হঠাৎ মিঠুন জানতে চায়, বাপি, টাকার রঙ কখনো কালো হয় ?

—হ্যাঁ হয়। তাকে বলে ব্ল্যাকমানি।

— সে টাকা কি খাওয়া যায় ?

—চিবিয়ে খাওয়া যায় না, তবে হ্যাঁ, খাওয়া যায় বৈকি।

—গিলে গিলে ?

া, কথার কথায়। যেমন ঘুড়ি গোঁৎ খায়, গোলকীপার গোল খায়, পরীক্ষায়

কেউ কেউ গোল্লা খায়। তারা চিবিয়েও খায় না, গিলে গিলেও খায় না। কথার কথায় খায়। তেমনি। ব্ল্যাকমানি একরকম ঘুষের টাকা। অসৎ লোক ব্ল্যাকমানিতে ঘুষ খায়।

মিঠুন অনেকক্ষণ কীসব ভাবল। তারপর জানতে চাইল, তুমি তো কালো টাকা খাও না, তাই না বাপি?

অশোক বললে, না। ওরা ভুল বলেছে। মিঠুনের বাপি ঘুষ খায় না। ব্ল্যাকমানি খায় না। বাড়ির নকশা বানায় শুধু। আর তার ছোট সোনা মিঠুনের সঙ্গে গল্প করে।

—'ওরা' কারা?

—ঐ যাদের সঙ্গে সেদিন তোমার মারামারি হল। স্কুলে।

এরপর বিস্তারিত সবকিছু স্বীকার করতে মিঠুনের আর কোথাও বাধল না। ও বারে বারে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, সে রাত্রে পুলিস ওদের বাড়িতে আসেনি। ওর বাপিকে পুলিসে খুঁজছে না। বাপি মোটেই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে না। কিন্তু ওরা শোনেনি। ঐ নীহারদারা! বিচ্ছিরি সব কথা বলেছে। তারপরই তো....

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে মিঠুন বাপের কোলে মুখ লুকিয়ে।

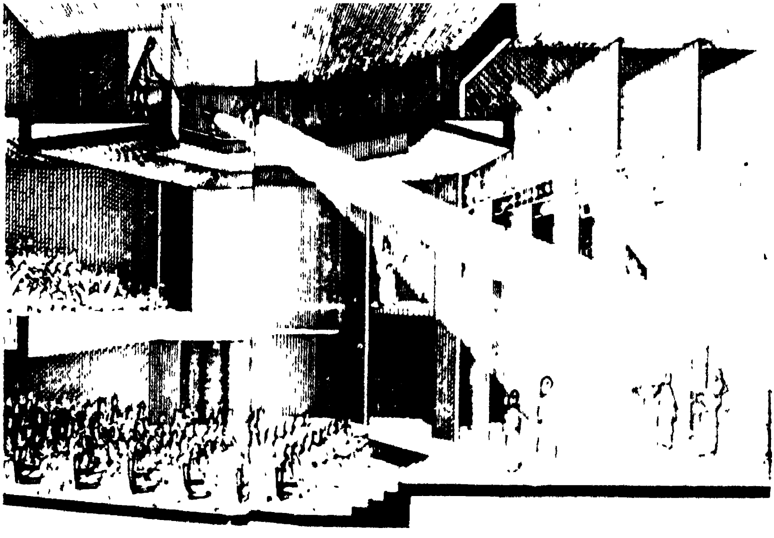

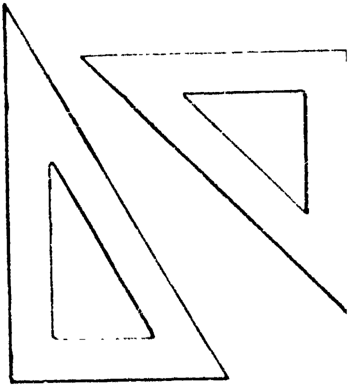

তারপর দিন বুধবার। অশোক খোঁজ নিয়ে জেনেছে, বুধবারটা শচীন দাশশর্মার সাপ্তাহিক অফ-ডে। আজ বৃষ্টি নেই। অশোক সকাল-সকাল গাড়িটা বার করল।

অলকাকে বলল মিঠুনকে সাজিয়ে দিতে। বাপ-বেটা কোথায় বুঝি বেড়াতে যাচেছ। অলকাকে কিছু জানায়নি। মিঠুনকে পাশের সীটে নিয়ে সোজা চলে এল ঠিকানা মিলিয়ে— এম. আই. জি. হাউসিং এস্টেটে। L/1 নম্বর ফ্ল্যাটে থাকে শচীন দাশশর্মা।

গাড়িটা পার্ক করে বললে, আয় মিঠুন আমার পিছু পিছু।

মিঠুনের কপালে তখনো ফেট্টি বাঁধা।

এল-বাই-ওয়ান একতলার ফ্ল্যাট। বৃষ্টি নেই। রোদও চড়া হয়নি। সকাল এখন আটটা। অশোক ডোর-বেলটা টিপে ধরল। ভিতরে মিঠে একটা মিউজিক্যাল চাইম।

মিনিটখানেকের মধ্যেই ইয়েল-লকওয়ালা পাল্লাটা ইঞ্চিদুয়েক ফাঁক হল। তারপর সেফটি ক্যাচে আটকে গেল। একটি বছর ত্রিশেক বয়সের বিবাহিত মহিলাকে দেখা গেল। জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকাতেই অশোক বললে,শচীনদা আছেন, না বাজারে বেরিয়ে গেছেন ?

মহিলা জিজ্ঞাসুনেত্রে পুনরায় তাকাতেই অশোক বললে, ওঁর সেই 'সঞ্জয় উবাচ'-র প্রবন্ধটার ব্যাপারে...

কথাটা মিথ্যা নয়। প্রথমত আত্মীয়সূচক সম্বোধন : 'শচীনদা'। তারপর ওয়াচ ওয়ার্ড : 'সঞ্জয় উবাচ'। ভদ্রমহিলা সেফ্‌টি ক্যাচটা খুলতে খুলতে বললেন, ও কি আপনার সাথেই এসেচে ?

—হ্যাঁ, আমার ছেলে, মিঠুন।

—ওর মাথায় কী হয়েছে ? ব্যাণ্ডেজ কেন ?

—আর বলবেন না। মারামারি করে মাথা ফাটিয়েছে।

ওদের ভিতরে আসবার আহ্বান জানালেন না। বললেন, হ্যাঁ, ও বাড়িতেই

আছে। দাঁড়ান, ডেকে দিচ্ছি।

দরজাটা খোলা রেখে উনি প্যাসেজের ও-প্রান্তে তাকিয়ে নেপথ্যে কাউকে বললেন, তোমাকে খুঁজছেন। অফিস থেকে।

পরমুহূর্তেই দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন বছর পঁয়ত্রিশের এক ভদ্রলোক। স্লিপিং স্যুট পরা। অশোকের আপাদমস্তকে নজর বুলিয়ে শুধু বললেন, ইয়েস ?

—মিস্টার শচীন দাশশর্মা ?

প্যাসেজের ওপ্রান্তে ঘুরে দাঁড়ালেন ভদ্রমহিলা। ব্যাপার কী ? একটু আগেই লোকটা 'শচীনদা' বলেছিল না ?

শচীন দাশশর্মা বললে, হ্যাঁ। বলুন ? কী চাই ?

অশোকের হাতে ধরা ছিল সাতই জুনের প্রেস কাটিং। সেটা বাড়িয়ে ধরে বললে, আপনার এই নিউজ আইটেমটার সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলতে এসেছি। ভেতরে আসব ?

দাশশর্মা রীতিমতো বিস্মিত। হাতবাড়িয়ে কাটিংটা সে গ্রহণ করে না। বলে, ওটা তো সেই সন্দীপ ধনপতিয়াব ভেঙে-পড়া বাড়ির খবরটা। এক মাসের বাসি খবর।

—একজ্যাক্টলি। এভাবে ছুটির দিনে আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আমাকে আসতে হয়েছে। আপনার ঐ প্রবন্ধের ভ্রান্ত সংবাদের জন্য আমি সমাজে অপদস্থ হচ্ছি, আমার বিজনেস মার খাচ্ছে, আমার ছেলের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে...

শচীন সবিস্ময়ে বলে, কী বকছেন মশাই পাগলের মতো! আপনি ব্যক্তিটি কে ?

—ও তাই তো। আমার পরিচয়টাই তো দেওয়া হয়নি। আমার নাম অশোক মুখার্জী। আমি মুখার্জী অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস্-এর...

তৎক্ষণাৎ দ্রুত কিছু অভিব্যক্তির পরিবর্তন হল শচীনবাবুর মুখে।

দু-পাল্লায় দুটি হাত রেখে দৃঢ়স্বরে বললে, নাউ লুক হিয়ার, মিস্টার মুখার্জী! আপনি এভাবে আমার বাড়িতে চড়াও হতে পারেন না। প্রত্যেকটা ব্যাপারেই একটা প্রচার চ্যানেল আছে। আপনি যদি প্রতিবাদ করতে চান তাহলে আমাদের কাগজে চিঠি...

—লিখেছি, স্যার। চিঠি লিখেছি। দু-দুবার আপনার সঙ্গে অফিসে দেখা করতে গেছি। আপনাদের নিউজ-এডিটার আমাকে ঢুকতে দেননি। তাই বাধ্য হয়ে ব্যাপারটা বোঝাতে আপনার বাড়িতে এসেছি, আমার অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে...

—ছেলে ? ছেলের প্রসঙ্গ আসছে কোথা থেকে ?

—বলব বলেই তো এসেছি মিস্টার দাশশর্মা। দরজাটা খুলুন। ভিতরে গিয়ে বসতে দিন আগে।

—না, মশাই, আমার সময় নেই। সরি!

—তার মানে আপনিও আপনার নিউজ এডিটারের সঙ্গে একমত?

—কী বিষয়ে?

—উনি বলেছিলেন, "আপনি যা ইচ্ছে করতে পারেন! খুন-জখম-আত্মহত্যা! শুধু আমাদের বিরক্ত করতে আসবেন না"।

—ঠিকই তো বলেছিলেন ভৈরবদা!

—সো য়ু ইনভাইট দিস্!

কোথাও কিছু নেই খোলা পাল্লা দুটির মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে থাকা শচীন দাশশর্মার নাকে দ্রাম করে একটা ঘুষি মেরে বসল অশোক। একেবারে আচমকা! এত জোরে নয় যে, নাকটা বেঁকে যাবে, অথবা 'সেপটাম কার্টিলেজ'টা স্থায়ীভাবে জখম হবে। তবে বেশ জোরেই। শচীন একটা মর্মান্তিক 'আঁ-ক' করে উঠল। একপা পিছিয়ে গেল সে। দু-হাতে নাকটা চাপা দিল। দু-চোখ তার জলে ভরে উঠেছে। নাকটা টান্‌ল সড়াৎ করে। তবু ওর অঞ্জলিতে দেখা গেল রক্ত। শচীন মর্মান্তিক দৃষ্টিতে একবার তাকালো অশোকের দিকে—যেন পাগলা-গারদ থেকে পালিয়ে-আসা একটা বদ্ধ উন্মাদকে দেখছে।

পরক্ষণেই ধ্রাশ করে বন্ধ হয়ে গেল ইয়েল-লক দরজা।

যেন কিছুই হয়নি। মিঠুনের হাতটা ধরে অশোক ডাকল, আয়!

মিঠুন প্রশ্ন করে, ওকে অমন করে মারলে কেন বাপি?

অশোক বললে, ও খবরের কাগজে মিথ্যে করে ছাপিয়ে দিয়েছে যে, আমি ব্ল্যাকমানি খেয়েছি। আমি ওকে বলতে এসেছিলাম সেটা মিছে কথা। তোকে দেখিয়ে বলতে চেয়েছিলাম, এই দেখ, তোমার মিথ্যে কথার জন্য আমার মিঠুন-সোনা অহেতুক মার খেয়েছে। তা ও আমার দুঃখের কথা—তোর দুঃখের কথা, শুনতে চাইল না। তাই ওর নাকটা থেঁৎলে দিয়েছি।

অশোক গাড়ির দিকে গেল না। মোড়ের পুলিসটার কাছে এগিয়ে গেল। ঘটনাচক্রে মোটর বাইক নিয়ে একজন সার্জেন্টও উপস্থিত ছিল সেখানে। তাকে দেখে অশোক ফিরে এল। কাছে এসে বললে, অফিসার! আপনি কাইন্ডলি আমার সঙ্গে আসুন। এই হাউসিং এস্টেটে এক্ষুণি একটা অ্যাসল্ট হয়েছে।

—কী হয়েছে?

—Assault, আক্রমণ। একজন লোক কলবেল বাজানোতে গৃহস্বামী যেই দোর খুলেছেন অমনি লোকটা দ্রাম করে তাঁর নাকে ঘুষি মেরে দিয়েছে। রক্ত ঝরছে।

—রক্ত ঝরছে? আপনি কী করে জানলেন?

—আমার স্বচক্ষে দেখা, সার্জেন্ট। রক্ত ঝরতে দেখেছি।

—এ ছেলেটি কে? ওর মাথায় ব্যান্ডেজ কখন বাঁধা হয়েছে?

—আমার ছেলে। ও ব্যান্ডেজ দুদিন আগে বাঁধা। আসুন।

—কতদূর ?

—এই তো সামনেই। এল-বাই ওয়ান কোয়ার্টার্স।

সার্জেন্ট মোটর-বাইকটা স্ট্যান্ডে তুলে ওর পিছু পিছু এগিয়ে এল। এল-বাই-ওয়ানের দরজা বন্ধ। অশোক বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বললে, এই বাড়ি।

সার্জেন্ট চারিদিকে একবার দেখে নেয়। কোন বাড়িতে বাহাজানি হলে এতক্ষণে সেখানে ভিড় জমে যাওয়ার কথা। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে অশোককে আপাদমস্তক একবার দেখে নিল। না! পাগল বলে তো মনে হচ্ছে না। সার্জেন্ট কলবেলটা টিপে ধরল।

দরজা ইঞ্চি-দুয়েক খুলে গেল। বিস্ময় বিমূঢ় একটি নারী মূর্তির আভাস। সার্জেন্ট কিছু বলার আগেই অশোক বলে ওঠে, মিসেস দাশশর্মা? শচীনদাকে কাইন্ডলি একবার ডেকে দিন। এই পুলিস অফিসারটি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চান।

সেফটি-ক্যাচ যথাস্থানেই রইল। সন্ত্রস্ত মহিলার মুণ্ডটি অন্তর্হিত হল। একটু দূরে শোনা গেল কিছু ফুসফুস-গুজগুজ। তাব ভিতর দুটি কথার শুধু অর্থগ্রহণ করা গেল—'পুলিস সার্জেন্ট' আর 'হ্যাঁ, সেই লোকটাই'।

মিনিটখানেক পরে দ্বারপথে এসে আবির্ভূত হল শচীন দাশশর্মার মূর্তি। তার জামায় দু-এক ফোঁটা রক্ত। একটা ভিজে তোয়ালে দিয়ে এক হাতে সে নাকটা চাপা দিয়ে আছে। তোয়ালেতে রক্তের দাগ।

অশোক তর্জনীসঙ্কেতে তাকে দেখিয়ে বলল, এঁর নাম শচীন দাশশর্মা!

সার্জেন্ট প্রশ্ন করে, আপনার নাম?

—শচীল দাশশম্মা!

অশোক বলে, মিনিট পনের আগে এঁকেই বেমক্কা মারা হয়েছে। নাকে এক ঘুষি। 'দ্রাম' করে!

সার্জেন্ট জানতে চায়. সত্যি কথা?

—হ্যা—নাকে-তোয়ালে শচীন জবাব দেয়। 'চন্দ্রবিন্দু' ছাড়াই।

—বুঝলাম!—বললে পুলিস সার্জেন্ট, বস্তুত বিন্দুমাত্র না বুঝে। পরমুহূর্তেই জানতে চায়, কে এমন করে মারল?

প্রশ্নটা সে জানতে চেয়েছিল শচীন দাশশর্মার কাছে। কিন্তু সে নির্বাক। জবাব এল সার্জেন্টের পিছন থেকে: আমি!

সার্জেন্ট অ্যাবাউট-টার্ন করে। অশোকের মুখোমুখি হয়ে বলে, আই বেগ য়োর পার্ডন, স্যার?

—আমিই ঘুষিটা বসিয়েছি। আমার ছেলে—সে অবশ্য নাবালক—সাক্ষী আছে! এটা একটা 'কমন অ্যাসল্ট কেস' তাই নয়, সার্জেন্ট?

সার্জেন্ট জবাব দেয় না। দাশশর্মাকে প্রশ্ন করে একথা সত্য কিনা। শিরশ্চালনে শচীন স্বীকার করে। বিস্মিত পুলিস অফিসারটি অশোকের দিকে ফিরে জানতে চায়, তা আপনি ওঁর নাকে কেন দ্রাম করে ঘুষি মারলেন?

—সেটা আমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলতে চাই না। থানায় গিয়ে বলব। তাহলে তার একটা লিখিত রেকর্ড থাকবে।

সার্জেন্ট বললে, ঠিক আছে। তাই যদি আপনার অভিরুচি। তাহলে একটা পুলিস ভ্যান আনাবার ব্যবস্থা করি ?

—কী দরকার ? আমার গাড়ি আছে। আপনার মোটর-বাইক তো মোড়ের পুলিসের জিম্মায়। চলুন আমিই আপনাকে নিয়ে যাব।

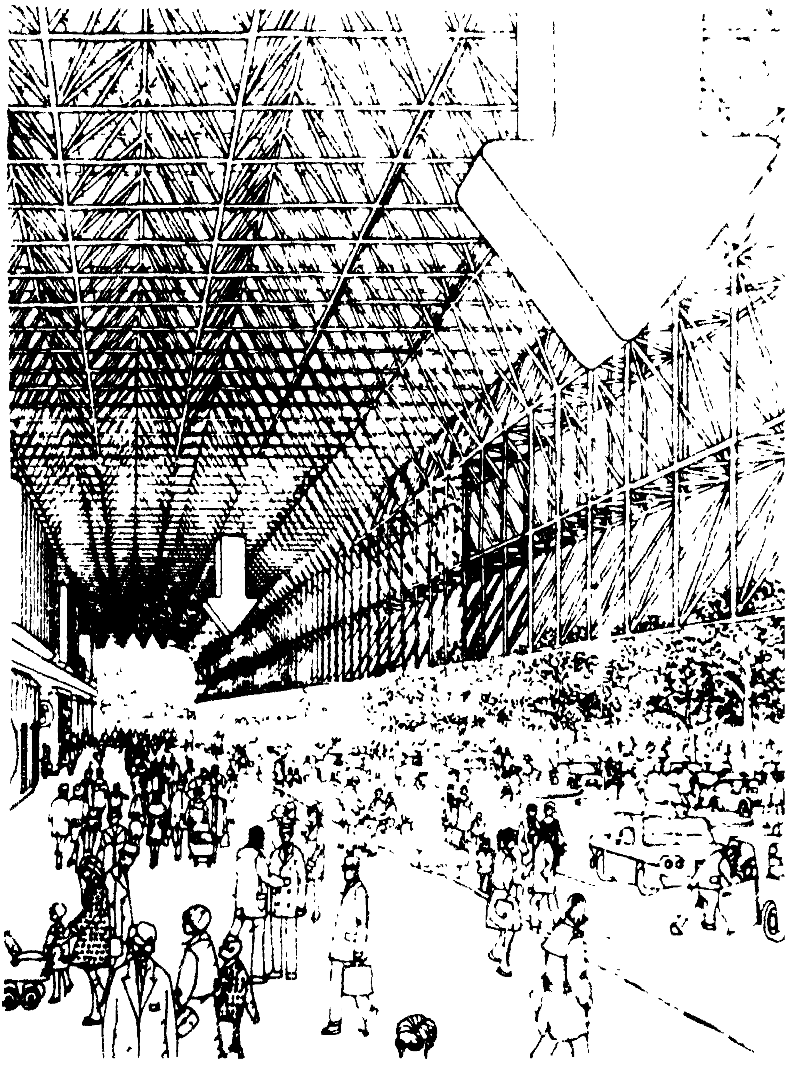

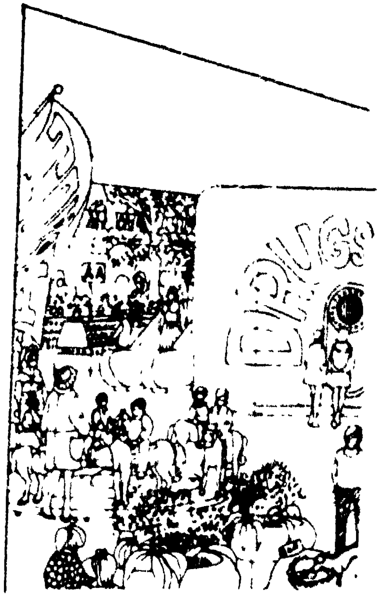

পুলিস-স্টেশনে ও.সি. নিজেই হাজির ছিলেন। সার্জেন্টের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনে ও.সি. নিজেও বেশ একটু চমকে উঠলেন। তবে তিনি পোড়-খাওয়া অভিজ্ঞ পুলিস অফিসার। দুনিয়ায় হরেক-রকম চিড়িয়া দেখেছেন। অশোককে প্রশ্ন করলেন, ঐ যে লোকটার নাকে আপনি ঘুষি মেরেছেন ওঁর নাম কী ?

—শচীন দাশশর্মা।

—কী করেন উনি ?

—'সঞ্জয় উবাচ' কাগজের স্টাফ রিপোর্টার, মানে সাংবাদিক।

—গুড গড ! আপনি তাঁর নাকে দ্রাম করে ঘুষি মেরে দিলেন ?

—দিলাম !

—কতদিনের আলাপ ?

—ওঁকে আজই প্রথম দেখলাম।

—অ। তা তিনি আপনার ঘুষি খেয়ে যখন চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করলেন না, ঘুষিটা হজম করলেন, তখন গুটি গুটি বাড়ি ফিরে গেলেন না কেন ?

—বাঃ। তাই কি পারি ? আইনত এটা একটা 'কেস্ অব অ্যাসল্ট' ! চোখের সামনে ঘটল ঘটনাটা। পুলিসকে না জানানো বেআইনী হয়ে যেত না কি ?

প্রায় দশ-সেকেন্ড ও.সি. সবিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখলেন। পোড়-খাওয়া পুলিস অফিসার তিনি। হরেক রকম চিড়িয়া দেখেছেন ; কিন্তু এমন তেঠ্যাঙা চিড়িয়া দেখেছেন বলে মনে করতে পারলেন না !

ও.সি. সার্জেন্টের দিকে ফিরে জানতে চাইলেন, আঘাতটা গুরুতর কি না। শচীন দাশশর্মা কোনও অভিযোগ করতে চেয়েছে কি না। দুটো প্রশ্নের জবাবই যখন 'না' হল তখন তিনি আত্মগতভাবে বললেন, একে সাংবাদিক, তার উপর 'সঞ্জয় উবাচ'। আগে একটা টেলিফোন করে জেনে নিই। ওঁর বাড়িতে নিশ্চয় ফোন আছে...

অশোক আগ বাড়িয়ে বলে, আছে, স্যার। এই যে! নম্বরটা আমার টোকা আছে।

একটুক্‌রো কাগজ সে বাড়িয়ে ধরে।

ও.সি. বলেন, এই যে আপনি তখন বললেন, 'আজই ওঁকে প্রথম দেখলাম?'

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আবারও তাই বলছি।

—অথচ ওঁর টেলিফোন নম্বর আপনার বুকপকেটে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বিশ্বাস না হয় ফোন করে দেখুন।

ও সি. দাশশর্মার বাড়িতে ফোন করলেন। কী প্রশ্নোত্তর হল বোঝা গেল না। ঐ অংশটা কাচের ঘেরাটোপে ঢাকা। সেখানে থেকে বেরিয়ে এসে ও.সি. বললেন, মিস্টার দাশশর্মা কেসটা চালাতে অনিচ্ছুক। 'সঞ্জয় উবাচ'ও কেস চালাতে চাইবে না বলছেন।

অশোক গম্ভীরভাবে বললে, দ্যাটস্ নট্ দ্য পয়েন্ট, অফিসার। এটা আমেরিকা নয়, ভারতবর্ষ। এখানে ব্রিটিশ ল ফলো করা হয়। ফ্যাক্ট হচ্ছে একটা 'কেস অব অ্যাসল্ট' হয়েছে। রক্তপাত যে হয়েছে আপনার সার্জেন্ট তার সাক্ষী। মিস্টার দাশশর্মা অথবা তাঁর এমপ্লয়ার কী চাইছেন তা 'ইম্‌মেটিরিয়াল'—কেস চালানো হবে কি হবে না, তা স্থির করবে 'স্টেট-পুলিস'।

—অ। আপনি তো আর্কিটেক্ট! এত আইন শিখলেন কোথায়?

—লাইব্রেরীতে!

—অ। তা আপনিই তো মানছেন যে, কেস চালানো হবে, কি হবে না, তা স্থির করবে 'স্টেট পুলিস'? কেমন তো? তা, হ্যাঁ মুখার্জি-সাহেব, এখানে স্টেট-পুলিসের প্রতিনিধিটি কে? আপনি না আমি?

—আপনি।

—তা হলে আমি স্থির করছি: কেস চালানো হবে না।

—দ্যাটস্ য়োর প্রিভিলেজ। সংবিধান আপনাকে সে অধিকার দিয়েছে!

— তাহলে এবার আসুন! দয়া করে বাড়ি যান।

— আজ্ঞে না। আপনার ঐ সিদ্ধান্ত-মোতাবেক আমাকে আবার যেতে হবে সেই এল-ওয়ান কোয়ার্টার্সে। আবার একটা ঘুষি মারতে হবে। দ্রাম করে! আর তার জন্যে আংশিকভাবে আপনি দায়ী থাকবেন কিন্তু ও.সি. সাহেব। কারণ আপনার সিদ্ধান্ত-মোতাবেক আমাকে এটা করতে হচ্ছে তো?

ও.সি. ওকে আপাদমস্তক আর একবার দেখে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। নাটকীয়ভাবে মাথার উপর দু-হাত তুলে বললেন, সারেন্ডার!

অশোক নির্বিকার।

মিঠুন অবাক হয়ে একবার এর দিকে একবার ওর দিকে তাকিয়ে দেখছে। 'সারেন্ডার' মানে সে বোঝে—সুপারম্যান আর ফ্যান্টমের কল্যাণে। কিন্তু এখানে

লড়াইটা হল কখন? ও.সি. ততক্ষণে হিপপকেট থেকে চার্জ-বইটা বার করে চেয়ারে বসে বলছেন : আপনার পুরো নাম? অ্যাড্রেস?

অশোক বললে, বলছি। তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন। 'অ্যাসল্ট'-এর চার্জে যদি আমাকে এখন হাজতে ঢোকান, তাহলে আমার এই ছেলেকে আমারই গাড়িতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থাটা করে দেবেন তো, ও. সি. সাহেব?

ও. সি. বললে, বলছি। তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন। নাকে ঘুষি মারবেন বলে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন, তখন ঐ দুধের বাছাকে কেন সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন বলুন তো?

—দুটো কৈফিয়ৎ। প্রথমত বাড়ি ছেড়ে যখন বার হই তখনো জানতাম না যে, ওর নাকে ওভাবে ঘুষি মারতে হবে। আমি গিয়েছিলাম লোকটাকে বোঝাতে যে, তার একটা ভুল নিউজ আইটেমের জন্যে আমার ছেলের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছেলেটাকে দেখলে ওর মনে দয়া হবে ভেবেছিলাম। তাই।

—দুটো কৈফিয়তের কথা বলেছিলেন। দ্বিতীয়টা?

—আমার ছেলেকে বোঝাতে চেয়েছিলাম, শুধু অন্যায় করা নয়, অন্যায় সহ্য করে যাওয়াও অন্যায়।

ও.সি. একবার বাপ একবার ছেলের দিকে দেখে নিয়ে বলল, আই প্রমিস্।

অবশ্য অশোকের ভাগ্য ভাল। কেস-হিস্ট্রি লিখে নেবার পর অশোককে হাজতে যেতে হল না। ব্যক্তিগত জামিনে ও. সি. তাকে ছেড়ে দিলেন। শুধু ওর ড্রাইভিং লাইসেন্স আর গাড়ির ব্লু-বুক আটক করে রসিদ দিলেন। পরদিন সকাল দশটায় অশোককে আলিপুরে সাবডিভিশনাল ক্রিমিনাল কোর্টে হাজির হয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে ফর্মাল জামিন নিতে হবে। পার্সোনাল বন্ডে নাকি চব্বিশ ঘণ্টার বেশি রাখা যায় না।

মিঠুনকে সঙ্গে করে গাড়ি নিয়েই অশোক ফিরে এল বাড়িতে।

বাড়ি ফেরার পথে মিঠুন আড়চোখে বারে বারে তার বাপির দিকে তাকিয়ে দেখছিল। তার বোধ করি মনে হচ্ছিল, পাশের সিটে বসে ঐ যে মানুষটা গাড়ি চালাচ্ছে ও লোকটাকে মিঠুন ঠিক মতো চেনে না। তার দীর্ঘ ছয় বছরের জীবন ধরে মিঠুন যে বাপিকে চিনত ও লোকটা সে যেন নয়! ও কখনো বাপিকে বক্সিং লড়তে দেখেনি। কিন্তু ওদের আলমারিতে রুপোর কাপটা কোথা থেকে এল এই প্রশ্ন করায় মায়ের কাছ থেকে প্রসঙ্গক্রমে জেনেছে, বাপি এককালে ছিল চাম্পিয়ান বক্সার। অ্যালবামে গ্লাভস্-পরা দ্বন্দ্বযুদ্ধরত বাপির একটা ফটোও দেখেছে। সেই ভরসাতেই হয়তো সেদিন স্কুলে তার সিনিয়র ছেলেদের যৌথ আক্রমণের সম্মুখে নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অথবা হয়তো মিঠুন এসব কিছুই ভাবছিল না। দ্রুত ঘটনাচক্রের আবর্তনে সে বিহ্বল হয়ে পড়েছে খানিকটা, ওই যা।

হঠাৎ সে প্রশ্ন করে বসে, বাপি! ঐ লোকটা কে? ওই যে তকমা-আঁটা পুলিশ, যে বললে : 'সারেন্ডার'!

অশোক এক নজর ওকে দেখে নিয়ে একটা প্রতিপশ্ন করে, আমরা ওটা কোথায় গেছিলাম তা কি তুমি বুঝতে পেরেছ? ওটা কি কারও বাড়ি, না অফিস?

—না বুঝতে পারিনি। ওটা কী?

—ওটাকে বলে থানা। পুলিস স্টেশন। 'থানা' কাকে বলে জান?

—জানি।

—তাহলে বলি, উনি হচ্ছেন থানার 'অফিসার ইনচার্জ'। অর্থাৎ পুলিস স্টেশনের অফিসার। সবচেয়ে বড় পুলিস।

—তা উনি হঠাৎ 'সারেন্ডার' বললেন কেন?

—'সারেন্ডার' মনে কী, তা তুমি জান?

—জানি। হার মেনে নেওয়া। যখন কেউ আর লড়াই করতে পারে না, তখন দু-হাত মাথার উপর তুলে বলে : সারেন্ডার!

—কারেক্ট! তাহলে তো তুমি বুঝতেই পেরেছ সব কিছু!

—না, বাপি। বুঝিনি। তোমাদের লড়াইটা হল কখন? কী ভাবে? তুমি তো ওঁকে ঘুষি মারনি? তা হলে উনি কেন বললেন....

—না। হাতাহাতি লড়াই আমরা করিনি। কিন্তু মৌখিক লড়াই করেছি। যুক্তি তর্কের লড়াই। 'যুক্তির লড়াই' কাকে বলে জান?

মিঠুন সংক্ষেপে বলে, জানি, এবার আর ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেষ্টা করে না।

খানিকক্ষণ সে চুপ-চাপ থাকে। কিন্তু দীর্ঘ সময় চুপ করে থাকা তার স্বভাববিরুদ্ধ। বোধকরি সেটা ও বয়সের ধর্মবিরুদ্ধও। তাই আবার হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে, আচ্ছা বাপি, রাস্তার মোড়ে যে খাঁকি পোশাক পরা পুলিশটা ছিল আর মোটর সাইকেল ওয়ালা যে পুলিশটা, মানে যে আমাদের গাড়িতে থানায় এল, ওরা কি একই জাতের পুলিশ?

অশোক বললে, জবাব দেওয়ার আগে তোমাকে দুটো কথা বলব। প্রথম কথা, তুমি ওদের 'তুমি' হিসাবে কথা বলছ কেন 'পুলিশটা থানায় এল' বলাটা কি ঠিক? উনি তোমার চেয়ে বয়সে কত বড়...

—আই মীন 'এলেন'...

—দ্যাটস রাইট। দ্বিতীয় কথা, তুমি বারে বারে 'পুলিস'কে 'পুলিশ' বলছ কেন? ইংরেজি Police কথাটাতে 'দন্ত্য-স' উচ্চারণ করা হয়, বাঙলাতেও তাই হওয়া উচিত...বাঙলায় school কে কেউ কেউ 'ইস্কুল' বলে, glassকে 'গেলাস' বলে; সেগুলো কি ঠিক?

মিঠুন এ নিয়ে তর্ক করল না। কিন্তু এই তালে তাব মূল প্রশ্নটা চাপা পড়ে

গেল।

বাড়ি ফিরে এসে অশোক যখন গাড়ি গ্যারেজ করায় ব্যস্ত ততক্ষণে মিঠুন একছুটে বাড়ির ভিতর। সাত-সকালে বাপির সঙ্গে গাড়ি নিয়ে বেড়িয়ে যে সুদুর্লভ অভিজ্ঞতটা সঞ্চয় করে এসেছে সেটা মাম্‌মিকে সবিস্তারে না জানানো তক্ তার ছোট্ট প্রাণটা খাঁচায় বন্ধ পাখির মতো ছট্‌ফট্ করছিল। বাইরে থেকে বাড়ি ফিরে এলে সবার আগে জামা-জুতো খুলতে হয়—এসব নীতিবাক্য ওর আজ আর স্মরণেই ছিল না। এক ছুট্রে মায়ের কাছে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ল। বলে, জান মাম্‌মি আজ কী ভীষণ কাণ্ড হয়েছে?

—কী সোনা? কী ভীষণ কাণ্ড হয়েছে?

—বাপি না...বাপি একজন ভদ্দরলোকের নাকে দ্রাম করে এক ঘুষি বসিয়ে দিয়েছে...

—যাঃ! তুই বানিয়ে বানিয়ে বলছিস! স্বপ্ন দেখেছিস্!

—না—! একদম সত্যি কথা! লোকটা 'অ্যাঁ-ক' করে উঠ্ল। তার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল। আমি নিজের চোক্ষে দেখেছি।

—হ্যাঁ! তুই নিজের চোখে দেখেছিস্! লোকটা ঘুষি খেয়ে নিজের বাড়ি চলে গেল, ঘরের ভিতর খিল্ দিয়ে হাপুস নয়নে কাঁদতে শুরু করল—তাই না?

—হ্যাঁ, তাই! 'আপন গড'। লোকটা ঘুষি খেয়ে স্রেফ পালিয়ে গেল। তাই তো বাপিকে পুলিশে, আই মীন, পুলিসে ধরল। আমাদের থানায় ধরে নিয়ে গেল। বাপি সেখানেও পুলিস্রের বড় অফিসারের সঙ্গে বক্সিং করল—মৌখিক বক্সিং, মানে যুক্তির বক্সিং! আর থানার বড়-পুলিশ, আই মীন বড় পুলিস, দু-হাত মাথার উপর তুলে, ঠিক এইভাবে বললেন: সারেন্ডার!

দু-হাত দুই কানের পাশ দিয়ে আকাশপানে তুলে ছোট্ট মিঠুন অভিনয় করে দেখিয়ে দেয় 'সারেন্ডাব'-এর ভঙ্গিমা।

অলকা খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে। বলে, তাই বুঝি?

মিঠুনের চোখ ফেটে জল এসে যায়। বুদ্ধিমান ছেলে। বুঝতে পারে মাম্‌মি তাকে এক ফোঁটাও বিশ্বাস করছে না। ব্যঙ্গ করছে।

ইতিমধ্যে গাড়ি গ্যারেজ করে অশোক এসে ঢুকেছে। সদর দরজার পাশেই একটা টুল রাখা থাকে। তাতে বসে ফিতে-বাঁধা জুতো খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অলকা বলে, ওগো শুনেছ? আজ একটা দারুণ কাণ্ড হয়েছে। মিঠুনের বাপি না—আজ কী দারুণ লড়াই করেছে! একটা লোকের নাকে ধ্রাস করে এমন ঘুষি কষিয়েছে যে, সে বাড়ি ফিরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে কাঁদতে শুরু করেছে।

মিঠুন প্রতিবাদ করে, ও কথা আমি বলিনি!

—বলিসনি? কী বলিসনি? এতক্ষণ ধরে তাই তো বলছিলি...

—'ধ্রাস' করে ঘুষি মারার কথা আমি বলেছি? আমি বলেছিলাম, 'দ্রাম' করে! তাই না বাপি? পুলিস অফিসারও তো তোমাকে তাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন: লোকটার নাকে আপনি 'দ্রাম' করে ঘুষি মারলেন কেন?

অশোক মাঝপথেই মিঠুনকে থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠে, কারেক্ট! অলকা ভুল বলেছে। 'ধ্রাস' করে কেউ ঘুষি মারে না। 'ধ্রাস' করে লোকে আছাড় খায়। ঘুসি—বিশেষ করে 'লেফ্‌ট-হ্যান্ড-পাঞ্চ' সব সময় মারতে হয় 'দ্রাম' করে।

অলকার মুখে দ্রুত কিছু ভাবের অভিব্যক্তির পরিবর্তন হল। একবার বাপের দিকে একবার ছেলের দিকে তাকিয়ে দেখে পরিস্থিতিটা সমঝে নিল। তারপর একবারে ভিন্নস্বরে বলল, কী ব্যাপার একটু বুঝিয়ে বল তো? সবটাই যে মিঠুনের দিবাস্বপ্ন নয় সেটুকু বুঝেছি। তুমি কি সত্যিই কারও সঙ্গে মারামারি করে এসেছ?

প্রশ্নটা অলকা পেশ করেছিল অশোকের দিকে ফিরে, কিন্তু জবাবটা এল ওর পিছন দিক থেকে। ক্ষুব্ধ মিঠুন বলে ওঠে, তুমি কিচ্ছু বোঝ না মাম্‌মি। বাপি মারামারি করবে কেন? স্রেফ একটা মাত্র ঘুষি...এক তরফা...'দ্রাম' করে...কেউ যদি মারে, আর সে লোকটা যদি 'আঁক' করে দরজা বন্ধ করে দেয়, তাকে কি 'মারামারি' করা বলে?

অলকার কণ্ঠে স্বর ফোটে না। অশোক তার হয়ে বলে, সার্টেনলি নট! তাকে বলে 'মারা', মারামারি করা নয়। অথবা 'ঠেঙানো'!

অলকা গম্ভীরভাবে বলে, তুমি কাকে ঠেঙিয়ে এসেছ?

'সঞ্জয় উবাচ'-র নিউজ রিপোর্টার মিস্টার শচীন দাশশমাকে। তাঁর বাড়ির সদর দরজার সামনে।

স্তম্ভিত অলকার কণ্ঠ থেকে অসংলগ্নভাবে প্রশ্নটা বেরিয়ে আসে: গুড গড! কেন?

অশোক মিঠুনের দিকে ফিরে বলে, য়ু এক্সপ্লেন, মিঠুন!

মিঠুন কী ভাবে ব্যাখ্যা দিল তা আর দাঁড়িয়ে শুনল না। রবারের চটিটা পায়ে দিয়ে শয়নকক্ষে প্রবেশ করল। আলমারির ভিতর এখন প্যান্ট-শার্ট-টাই খুলে সাজিয়ে রাখতে হবে। ওখানেই থাকে ওর পায়জামা—যা ও এখন পরবে।

মিঠুন তার মা-কে বোঝাবার চেষ্টা করে, তার কারণ ও লোকটা কাগজে ছাপিয়ে দিয়েছিল...আই মীন, উনি কাগজে ছাপিয়ে দিয়েছিলেন যে, বাপি ব্ল্যাকমানি খেয়েছে। বাপি তাই ওঁকে বলতে চেয়েছিল সেটা মিছে কথা। আমাকে দেখিয়ে বাপি বলতে চেয়েছিল, এই দেখুন, আপনার মিছে কথার জন্য মিঠুনকে ওর মেরেছে। সুবলদা, নীহারদা...। তা উনি আমাদের দুঃখের কথা শুনতে চাইলেন না। তাই বাপি ওঁর নাকটা থেঁৎলে দিয়েছে। এক ঘুষিতে! দ্রাম করে!

ঘরের ভিতর আলমারির সামনে অশোক চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল পুত্রগর্বে ওর বুকটা ভরে যায়। প্রায় শ্রুতিধরের ক্ষমতায় সে তার বাপির কাছে

শোনা যুক্তিটা এখন পেশ করেছে।

অলকার কিন্তু কৌতূহল মেটে না। ঘরের ভিতর চলে আসে। অশোকের হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে বসিয়ে দেয় ডবল-বেড পালঙ্কে। বলে, আগে বল দেখি, সত্যি কী হয়েছে! বিস্তারিত করে বুঝিয়ে বল দিকিন।

অশোকের ফুলপ্যান্ট খোলা হয়েছে অথচ গলার টাই যথাস্থানে। নিম্নাঙ্গে ড্রয়ার। ঐ অবস্থাতেই তাকে সংক্ষেপে বিবৃতি দিতে হল। মিঠুন ততক্ষণে নিজের ঘরে চলে গেছে পোশাক বদলাতে।

সমস্ত ঘটনাটা শুনে অলকা বিহ্বল হয়ে পড়ে। বলে, এ রকম একটা ড্রাস্টিক স্টেপ কেন নিলে, অশোক?

—আমার সামনে আর কোন বিকল্প পথ খোলা ছিল না, অলকা! আমি ঐ একটা মাত্র রাস্তাই খোলা দেখতে পেলাম; ফ্রেডেরিক ফরসাইথের লেখা: 'প্রিভিলেজ'!...আমি আসামীর ভূমিকায় কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াতে চাই! বাদী নয়, প্রতিবাদী হিসাবে! কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামী কতকগুলো কন্সটিটিউশানাল প্রিভিলেজ পায়—সাংবিধানিক রক্ষাকবচ—সেটাই আমার গুলতি বাঁটুল!

—গুলতি-বাঁটুল? তার মানে?

—ফ্লোরেন্সের অ্যাকাডেমিয়ায় রাখা মিকেলাঞ্জেলোর মার্বেলে গড়া ডেভিড মূর্তিটা তুমি দেখনি, কিন্তু তার ছবি দেখেছ কি?

—না, কেন?

—আশ্চর্য! কোনও কলেজে-পড়া শিক্ষিত মেয়ে প্রাক-বিবাহ জীবনে মিকেলাঞ্জেলোর 'ডেভিড' লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেনি, এটা আমার বিশ্বাসই হতে চায় না!

—কী বকছ পাগলের মতো! কেন?

—কারণ বিশ্বভাস্কর্যের ইতিহাসে ওর চেয়ে অ্যাট্রাক্টিভ 'মেল-ন্যুড' গড়া হয়নি বলে। আমার তো ধারণা, কোন মেয়ে সেই 'ডেভিড'-এর পিকচার-পোস্টকার্ড এক নজর দেখে কিছুতেই থামতে পারবে না। তাকে ফিরে ফিরে আবার দেখতে হবে: 'বিহসি পালটি নেহারি!'

—অসভ্য কোথাকার! শুধু মেয়েরাই বুঝি অমন?

—সে কথা তো আমি বলিনি। কনভার্স থিয়োরেমটাও খাঁটি। আঁগরের 'লা-সূর্স'-ছবিখানায় যে ন্যুড ষোড়শী তার দিকে কোনও পুরুষ 'টিন এজার'....

—বাজে কথা বাদ দাও, 'ডেভিড' এর গুলতির কথা কী বলছিলে তখন?

—বাইবেলের চরিত্র 'ডেভিড' লড়াই করেছিল মহান শক্তিশালী দৈত্য গোলিয়াথ-এর সঙ্গে। দৈত্যের হাতিয়ার ছিল নানান রকম—তরোয়াল, ঢাল, বর্শা, ইত্যাদি প্রভৃতি। আর কিশোর 'ডেভিড'-এর ছিল শুধুমাত্র গুলতি-বাঁটুল! মিকেলাঞ্জেলো বোধকরি সেজন্যই ডেভিডকে নগ্ন করে গড়েছেন। ওর আস্তিন নেই

যে, তার তলায় কোন অস্ত্র লুকিয়ে রাখবে। ওর পকেট নেই, যেখানে মানিব্যাগ লুকিয়ে রাখবে। ও নয়! তারুণ্য ভিন্ন তার একমাত্র অস্ত্র ঐ গুলতি-বাঁটুল!

অলকা বলে, এখানে তার রেলিভেন্স কী?

—বুঝলে না? মানহানির মকদ্দমা করলে আমি হব বাদী, 'সঞ্জয় উবাচ' পত্রিকা প্রতিবাদী। আমি তা চাই না। আমি প্রতিবাদী হতে চাই দেওয়ানী মামলার দীর্ঘসূত্রতা আমার পোষাবে না, তাই আমি চাই—ফৌজদারী মামলা। জজ কোর্টে না, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে! সেখানে আমি মিকেলাঞ্জেলোর ডেভিড এর মতো নিরাবরণ সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে চাই! ঐ বিরাট দৈত্যটাকেও আমি উলঙ্গ করে ছাড়ব। ওদের আর্থিক ক্ষমতা যতই থাক, অলকা, আমার বাঁ-কাঁধে থাকবে ঐ গুলতি-বাঁটুল—ভারতীয় সংবিধান আমাকে প্রতিবাদী হিসাবে যে অমূল্য সম্পদটা দিয়েছে: আসামীর 'প্রিভিলেজ'!

পরদিন সাবডিভিশনাল ক্রিমিনাল কোর্টে 'অন রিমান্ড' হাজিরা দিল অশোক।

ম্যাজিস্ট্রেট জামিন মঞ্জুর করার আগে জানতে চাইলেন তার 'প্লী' কী? অর্থাৎ পুলিস তার বিরুদ্ধে যে চার্য এনেছে সে-বিষয়ে অভিযুক্ত নিজেকে কী বলতে চায়: দোষী না নির্দোষ?

অশোক ফরসাইথের 'প্রিভিলেজ' গল্পটা বার-তিনেক পড়েছে। আইনের ঘোরপ্যাঁচ তার মুখস্থ। সে জানালো যে, সে আত্মসমীক্ষা করছে, এখনো ঠিক মনস্থির করে উঠতে পারেনি। কখনো মনে হচ্ছে সে নির্দোষ, কখনো দোষী। নিজের বিবেকের বিচারে....

ম্যাজিস্ট্রেট ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেন, প্রতিটি অভিযুক্তের বিবেকের কেচ্ছা শোনার মতো সময় তাঁর নেই। তিনি এককথার জবাব চান। অভিযুক্তের 'প্লী' কী? গিল্‌টি অর নট্ গিল্‌টি?

অশোকের চটজলদি জবাব: দ্য আকিউজড ইজ ইয়েট আনডিসাইডেড অ্যাবাউট হিজ প্লী।

—অলরাইট! অলরাইট। তাই লিখে দিলাম আমি।

ম্যাজিস্ট্রেট ওকে একশ' টাকার ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি দিলেন, কারণ ঐ সঙ্গে তিনি পুলিসকে নির্দেশ দিলেন অভিযুক্তের ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং গাড়ির ব্লু-বুক আটক থাকবে পুলিস-হেপাজতে। এমতাবস্থায় অপরাধীর পক্ষে গা-ঢাকা দেওয়া অসম্ভব। দুই সপ্তাহ পরে তাকে আবার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজিরা দিয়ে নতুন করে জামিন নিতে হবে, যদি না ইতিমধ্যে পুলিস কেসটা আদালতে নিয়ে আসে। তার সম্ভাবনা অবশ্য খুবই ক্ষীণ, কারণ পুলিসের খাতায় এমন 'পেটি কেস' শত শত। যা হোক, জামিন নেবার ব্যাপারটা পাঁচ মিনিটও লাগল না।

ওর মামলার দিন পড়ল সোমবার, উনত্রিশে জুলাই। ইতিমধ্যে অশোক সস্ত্রীক বাসু-সাহেবের সঙ্গে দেখা করে তালিম নিয়ে এসেছে। তাঁকে জানিয়েছে ফরসাইথের

কাহিনীর নায়ক 'বিল চ্যাডউইক্'-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে সে। বাসু-সাহেব ওকে ব্রিটিশ ল আর ভারতীয় আইনের যেখানে যেখানে পার্থক্য আছে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। সে-জন্য কিছু পরিবর্তনও করতে হয়েছে। গল্পের নায়কের তরফে কোন উকিল ছিল না, সে একাই বাঘের বাচ্চার মতো পত্রিকার বিরুদ্ধে কেস লড়ে গেছিল, কিন্তু অশোক তা করবে না। কেসের আর্গুমেন্ট সে নিজেই করবে, তবু বাসু-মেসোকে সে ওকালতনামা দিয়ে রেখেছে, যাতে প্রতিবাদী তরফের সাক্ষীদের সমন ধরানোতে কোন অসুবিধা না হয়। অন্যথায় 'সঞ্জয় উবাচ' হৌসের দু-দুজন স্টাফ—চিফ নিউজ এডিটার ভৈরব লাহিড়ী আর রিসেপশানিস্ট আরতি মিত্রকে সাক্ষীর ডকে তোলা সম্ভবপর হবে না। ভৈরব সম্ভবত অচিরেই চিহ্নিত হবে 'হোস্টাইল উইটনেস' হিসাবে। তা হোক—তবু তার সাক্ষ্যটা নিতান্ত জরুরী। স্বেচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তাকে দিয়ে বলাতেই হবে যে, অশোক চেষ্টার ত্রুটি করেনি। তাছাড়া ঘুষিটা সে ঘটনাচক্রে—বলা যায় বাধ্য হয়ে—মেরেছে শচীন দাশশর্মার নাকে : কিন্তু তার ইচ্ছা ছিল সেটা ঐ ভৈরবের নাকউঁচু ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা।

ইতিমধ্যে খবর নিয়ে জেনেছে লোকটা স্বভাবগতভাবে উদ্ধত। সহকর্মীদেব সঙ্গে ক্রমাগত দুর্ব্যবহার করে। মদ্যপ, তার নিজের ধারণা সে আঁতেল। আধুনিক চিত্র, মঞ্চাভিনয় এবং ফিল্ম সম্বন্ধে সে একজন স্বয়ং-স্বীকৃত অথরিটি। পাঁচজনে কী বলে তা কে শুনছে? খবরের কাগজ যাকে মই দিয়ে ঠেলে আকাশে তুলে দেবে, সে আকাশপিদিম! তেল—অর্থাৎ চাকরি—যতদিন আছে ততদিন সে ঐ আকাশে জ্বলজ্বল করে জ্বলবে। বিশেষ বিশেষ চিত্রকরের প্রদর্শনী, বিশেষ বিশেষ শিল্পী বা পরিচালকের নাটক উনি নিজে দেখতে যান। আমন্ত্রণের কার্ড না থাকলে টিকিট কেটে। তার পর থোড়-কুচানোর কায়দায় সেই হৌস-অস্বীকৃত শিল্পীকে কুচি কুচি করা হয়। এ হেন হোস্টাইল সাক্ষীকে দিয়ে কিছু স্বীকার করিয়ে নেওয়া খুবই শক্ত—কিন্তু উপায় নেই, একমাত্র ঐ ভৈরব লাহিড়ীব সাক্ষ্যেই অশোককে প্রমাণ করতে হবে যে, সে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। তার আকাঙ্ক্ষা ছিল সামান্যই—একটা ভ্রমসংশোধনী সংযুক্তি। কাগজ শুধু বলবে ভ্রমবশতঃ ইতিপূর্বে ছাপা হয়েছে যে, ভেঙে-পড়া বাড়ির স্থপতি অশোক মুখার্জি। বাস্তবে অশোকের প্ল্যানে ঐ বেআইনী বাড়িটি নির্মিত হচ্ছিল না। কিন্তু সে কাজটা কিছুতেই করানো যায়নি ভৈরব ভৈরবমূর্তিতে ব্যূহমুখে পাহারা দেওয়ায়।

মিসেস্ মিত্র অবশ্য সে-রকম কেস নয়। একথা নিশ্চিত যে, আরতি সমন পেয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আসবে। নিজের এবং এমপ্লয়াবের স্বার্থ তাকে দেখতে হবেই—চাকরির খাতিরে—তবু হলফ নিয়ে আদালতে দাঁড়িয়ে সে মিথ্যাসাক্ষ্য দেবে না নিশ্চয়।

আর সে তো অন্যায় কিছু করেনি। তার ভয়টা কী?

জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে কলকাতার সব কয়টি নামকরা সংবাদপত্রের অফিসে কী ইংরেজি, কী বাঙলা, কী হিন্দি—বিচিত্র কিছু টেলিফোন আসতে থাকে। অজ্ঞাত-পরিচয় এক ব্যক্তির টিপ্‌স্‌। সংবাদপত্র এতে অভ্যস্ত। অজানা লোকটি জানাচ্ছে উনত্রিশে জুলাই আলিপুরের সাবডিসিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে একটি আকর্ষণীয় মামলার শুনানী আছে। কে-একটা ভুঁইফোড় লোক 'সঞ্জয় উবাচ' পত্রিকার জাঁদরেল সাংবাদিক শচীন দাশশর্মার বাড়িতে চড়াও হয়ে তাঁর নাকে ঘুষি মেরে রক্তপাত ঘটায়। আহত সাংবাদিক পুলিস-কেস করেনি, এটা স্টেট ভার্সেস পার্টির কেস। আকর্ষণীয় রিপোর্টিং হতে পারে। 'সঞ্জয় উবাচ' পত্রিকার সাংবাদিককে কেউ বাড়িতে চড়াও হয়ে ঠেঙিয়েছে সেটা এখনো কেউ জানে না। কোন কাগজে তা বার হয়নি। শচীন দাশশর্মা একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি, সাংবাদিক মহলে। প্রেসক্লাবের অন্যতম হর্তাকর্তা। অসুস্থ হওয়ায় দিন-দশেক লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, এই যা।

সকলেই আদালতে ফোন করে দেখল এরকম একটা ফৌজধারী মামলা ফার্স্টক্লাস ম্যাজিস্টেট প্রভাস ধরের এজলাসে নথিভুক্ত আছে বটে। সকলেই নিজ নিজ সংবাদদাতা ও ফটোগ্রাফার পাঠাবাব ব্যবস্থা করে। নিউজ এজেন্সির রিপোর্টের উপর নির্ভর না করে।

'সঞ্জয়-উবাচ'-হৌসে কেউ ফোন করেনি। মামলা স্টেট ভার্সেস মুখার্জির; কিন্তু হৌসের কর্মকর্তারা অত্যন্ত সজাগ ও দক্ষ। শচীন দাশশর্মার কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনে তাঁরা আত্মরক্ষায় সচেতন হলেন। পত্রিকার স্বার্থ দেখতে যেন লীগ্যাল অ্যাডভাইসার আদালতে উপস্থিত থাকেন।

গোদের ওপব বিষফোড়া: নাকের উপর ঘুষিটা খেয়েছে শচীন, পুলিস তাকে আদালতে উপস্থিত থাকতে বলবে এটা জানা ছিল, কিন্তু দেখা গেল ঐ সঙ্গে প্রতিবাদীর তরফে হৌসের আরও দুজন কর্মীকে সমন ধরানো হয়েছে। এক নম্বর: রিসেপ্‌শানিস্ট মিসেস্‌ আরতি মিত্র, দু নম্বর: চীফ নিউজ এডিটার ভৈরব লাহিড়ী।

দু-জনেরই ডাক পড়ল খোদ বড়কর্তার ঘরে।

উনি দুজনকে পৃথক পৃথক ডেকে পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু ঘটনাচক্রে, দুজনে একই সময়ে উপস্তিত হলেন বড়-কর্তার খাশকামরা সংলগ্ন রিসেপশান হল-এ।

ভৈরব আরতিকে দেখে ভ্রূকুটি করলেন: তুমি আবার কী চাও?

—না, ভৈরবদা। আমি কিছু চাইতে আসিনি। স্যারই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

—সেরেছে। তোমাকেও কি সেই মাম্‌লাবাজ মুখুজ্জে সমন ধরিয়েছে নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তা আপনিই আগে যান। আমি বরং অপেক্ষা করছি।

—না বাপু! লেডিজ ফার্স্ট। তুমিই আগে যাও। আমি ততক্ষণ একটু বুদ্ধির

গোড়ায় ধোঁওয়া দিয়ে নিই।

ভৈরব একটি সিগারেট ধরালেন।

আরতি এগিয়ে গেল। দ্বারের পাশে টুলে বসে আছে সাহেবের খাশ আর্দালি। তার কাছে জিজ্ঞাসা করে শুনল, ঘরে দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ নেই। ভারী পর্দাটা একটু সরিয়ে প্রশ্ন করে, আসতে পারি ?

উনি কী-একটা রিপোর্ট পড়ছিলেন। ওর কণ্ঠস্বরে দ্বারপথে তাকিয়ে দেখলেন। বললেন, আরতি মিত্র ?

—ইয়েস স্যার।

—এস, বস ঐ চেয়ারটায়।

আরতি নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে ভাবতে থাকে : উনি কীভাবে তাকে চিনতে পারলেন। তার সাত-বছরের চাকরি-জীবনে সে এই ঘরে ইতিপূর্বে একবারও আসেনি। পত্রিকার মালিকানার সিংহভাগ যাঁর অধিকারে, সম্পাদক হিসাবে যাঁর নাম ছাপা হয়, তিনি এতই উচ্চমহলের বাসিন্দা যে, তাঁর পক্ষে সামান্য রিসেপ্‌শানিস্টকে চিনে রাখা প্রায় অসম্ভব। প্রবেশপথে হয়তো বহুবার তাকে দেখেছেন, ফলে অফিসের একজন রিসেপশানিস্ট বলে ওকে সনাক্ত করা সম্ভব ; কিন্তু নামটা কেমন করে জানলেন ?

রিপোর্টের বাকি অংশটুকু পাঠ শেষ করে উনি তাব তলায় স্বাক্ষর দিলেন। 'বেল' বাজিয়ে আর্দালিকে ডেকে তার হাতে কাগজখানা ধরিয়ে দিয়ে বললেন : সুরেনবাবু।

লোকটা সেই কাগজখানা নিয়ে প্রস্থান করা মাত্র উনি প্রশ্ন করেন,আরতি, তুমি নাকি শচীনের অ্যাসল্ট কেসে ডিফেণ্ডাবের তরফে সামন্স পেয়েছ ?

—হ্যাঁ, সার।

—বাট হাউ আর য়ু ইন্‌ভলভড্‌ ? তুমি এ কেসে কীভাবে জড়িয়ে পড়লে তা আন্দাজ করতে পার ?

আরতি সপ্রতিভভাবে বললে, পারি, স্যার। ঐ ভদ্রলোক—আই মীন, মিস্টার অশোক মুখার্জি, যেদিন অফিসে দেখা করতে আসেন, সেদিন আমিই রিসেপশান কাউন্টারে ছিলাম।

—আই সি। সে বুঝি নিজেই একদিন এ অফিসে এসেছিল ? কার সঙ্গে দেখা করতে চাইল ?

আরতি ইতস্তত করছে দেখে উনি বললেন, তুমি বিস্তারিত বলে যাও তো। কী কী কথোপকথন হয়েছিল। যতটা তোমার মনে আছে। আনুপূর্বিকভাবে।

আরতি তা জানালো। ভৈরবচন্দ্রের দুর্ব্যবহারের ব্যাপারটা গতদূর সম্ভব সংক্ষেপে এবং মোলায়েমভাবে পেশ করল। প্রথম কথা, কালভৈরবকে সে শত্রু করতে চায় না ; দ্বিতীযত প্রবীর ওকে সেই পরামর্শই দিয়েছিল।

ভগবান ওর সহায়। মালিক একতরফা জবানবন্দিটা শুধু শুনেই গেলেন। কোন রকম জেরা করলেন না। বললেন, আমি ব্যাপারটা তোমার কাছ থেকে ফার্স্টহ্যাণ্ড জেনে নিতে চেয়েছিলাম শুধু। ঠিক আছে, তুমি যেতে পার।

ও সাহস করে প্রশ্ন করে, আদালতে জিজ্ঞাসিত হলে...

ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে রাশভারী প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বলে ওঠেন, আদ্যন্ত সত্যকথা বলবে! ট্রুথ.....হোলট্রুথ......অ্যাণ্ড নাথিং বাট দ্য ট্রুথ.....

নমস্কার করে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

ওর মনের মধ্যে একটা কাঁটা খচ্-খচ্ করে বিঁধছে। তার নিয়োগকর্তাকে সে কিন্তু আদ্যন্ত নির্ভেজাল সত্য কথা বলেনি। আনুপূর্বিক বলেছে, বলেনি উপসংহারটুকু! কফি -হাউস-এর পাদপূরণ অথবা পরে শচীনদার বাড়ির ঠিকানা সরবরাহ করা।

ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতেই ভৈরব লাহিড়ীর মুখোমুখি। তিনি সেকেন্ড স্লিপ ফিল্ডারের মতো আদার্লির পাশে দুহাত বাড়িয়ে ওকে লুফে নেবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

বলেন, কী হল?

—হয়নি তো কিছু!

—আরে না, না। কথাবার্তা কী হল?

—বিশেষ কিছু নয়। স্যার বললেন, আদালতে আদ্যন্ত সত্যকথা বলবে।

—আই সী! আচ্ছা যাও তুমি।

আবতি দৃষ্টিপথের বাইরে যেতেই পর্দাটা সরিয়ে ভৈরব খোদ বড়-কর্তার ঘরে উঁকি দিলেন: আপনি আমাকে ডেকেছিলেন, স্যার?

—হ্যাঁ। আসুন। পি. কে. বাসু ব্যারিস্টার আপনাকে সমন ধবালো কেন কিছু আন্দাজ করতে পারেন? আপনি কি ঐ সন্দীপ ধনপতিযার কেসের বিষয়ে সেই মুখার্জি ছোকরার সঙ্গে কিছু আলোচনা করেছিলেন?

—লোকটাকে আমি চোখেই দেখিনি, স্যার!

ট্রুথ! হোল ট্রুথ। এবং নাথিং-বাট-দ্য-ট্রুথ!

কিন্তু উনি তাতেও সন্তুষ্ট নয়! এর পরেও প্রশ্ন করেন: বাট হোযাই?

—আজ্ঞে?

—লোকটা আমাদের অফিসে এল। বিসেপশানিস্ট আপনার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করিয়ে দিল—তবু আপনি কেন তাকে চোখেই দেখলেন না?

ভৈরব বসবেন না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথাবার্তা চালিয়ে যাবেন ঠাওর করে উঠতে পারেন না। কোনক্রমে বলে বসেন, ও লোকটা আমাদের উকিলের চিঠি দিয়েছিল, স্যার।

—আই নো! কিন্তু কেন? আমরা একটা ভুল খবর ছেপেছিলাম বলে, তাই

নয়? যার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আপনার, অথচ....

—শচীন যে এভাবে খোঁজখবর না নিয়েই....

—প্লীজ ডোন্ট টক, হোয়েন আয়াম টকিং!

ভৈরব মাঝপথেই থেমে পড়েন।

—দায়িত্ব আপনার, তা অস্বীকার করতে পারেন?

ভৈরব নীরব।

এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। অধস্তন সাংবাদিক ভুল সংবাদ সরবরাহ করলে যেমন রিপোর্টার দায়ী, তেমনি চীফ নিউজ এডিটার দায়ী।

—শুধু আপনি একা নন, আরও একজন দায়ী। সে কে, জানেন?

—শচীন....

—নো! আমি! এডিটার অব দ্য পেপার!

ভৈরব এবারও জবাব খুঁজে পান না।

—যান। সাবধানে সাক্ষী দেবেন। সেন্সে থাকবেন। যান!

'সেন্সে থাকবেন'! কী লজ্জা! উপায় নেই। উনি সব জানেন।

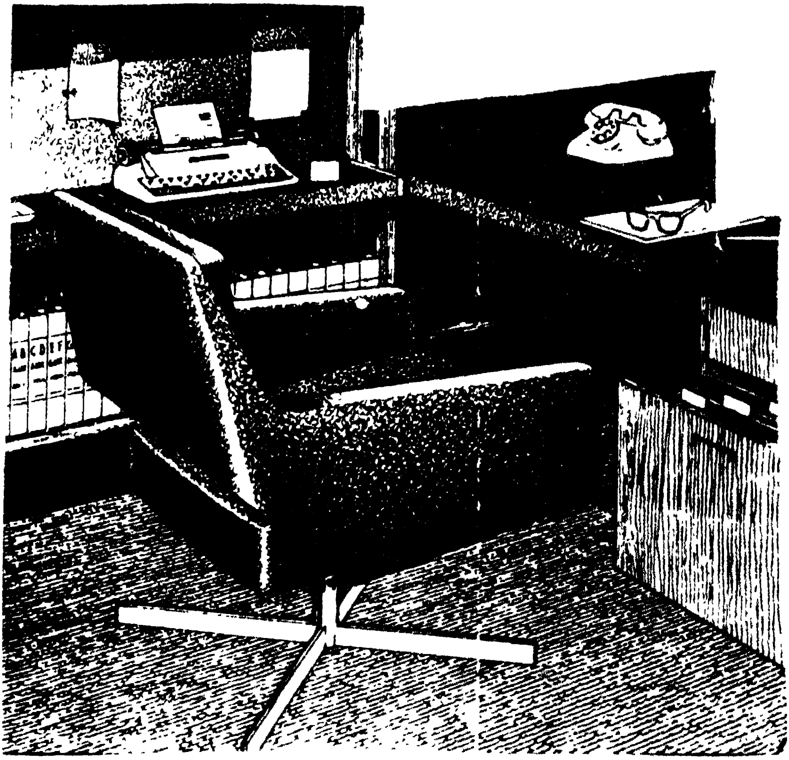

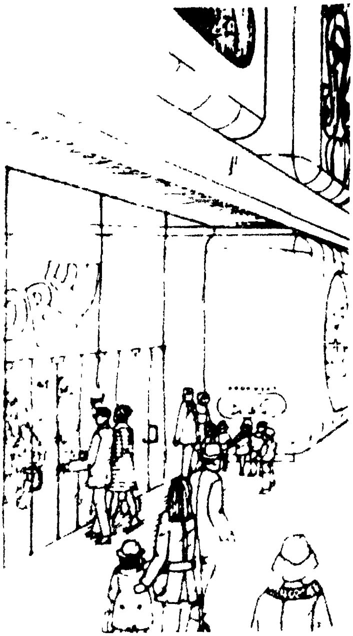

'ল অব লাইবেল' নামে একটা বই বাসু-মেসো ওকে পড়তে দিয়েছেন। তাই পড়ছিল বসে বসে। গত দু-মাসে 'আর্কিটেক্‌চারাল জার্নাল' যা এসেছে তা কভাব-মুক্ত হয়নি। এই মামলার এস্‌পার ওস্‌পাব না হওয়া পর্যন্ত অশোক অন্য কিছুতে মন দিতে পারছে না। ঠিকই বলেছিলেন ভৈরব লাহিড়ী: মাম্‌লাবাজ মুখুজ্জে।

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল।

অশোক রিসিভারটা তুলে নিয়ে অভ্যাসবশে নিজের নাম্বারটা ঘোষণা করল। ও প্রান্তবাসী ইংরেজিতে বলেন, মিস্টার্ অশোক মুখার্জির সঙ্গে কথা বলতে পারি ?

—মুখার্জি স্পিকিং।

— গুড আফটারনুন মিস্টার মুখার্জি! আমাব নাম প্রবীর মিত্র।

অশোক কি এমনই একটা কিছু প্রত্যাশা কবছিল ? সপ্রতিভভাবে বলে, গুড আফটারনুন, মিস্টার মিত্র। বলুন, কী বলবেন ?

—আপনি আমাকে নিশ্চয় প্লেস করতে পারেননি।

—আপনার ধারণাটা ভুল। আমি আপনাকে ঠিকই চিনেছি।

—বটে! বলুন তো কবে আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয়েছে ?

—আমাদের আদৌ সাক্ষাৎ হয়নি। এমনকি টেলিফোনেও কখনো আলাপ করার সৌভাগ্য হয়নি। তবু আপনাকে চিনেছি। কারণ যে ভদ্রমহিলা আপনার আয়ুষ্কামনায় সিঁথিতে....

—অ্যা-ইয়েস! স্বীকার করছি, আপনি চিনেছেন।

—এবার বলুন ? কী ভাবে আপনার উপকার করতে পারি ? আপনি কি সল্ট লেকে একটা প্লটের অ্যালটমেন্ট পেয়েছেন!

—সল্ট লেক ? তার মানে ?

—লোকে তো বাড়ি তৈরী করার জন্যই আমাকে খোঁজে।

—আমি খুঁজছি একটু ভিন্ন হেতুতে। আমাদের তৈরী বাড়িটা যাতে ধ্বসে না যায়! আমাদের দুজনের এই ভালো বাসাটা!

—আর একটু বুঝিয়ে বলুন?

—আপনার উকিলের সামন্স ও পেয়েছে। যেতে ওকে হবেই; কিন্তু আপনার উপকার ছাড়া অপকার কি সে কিছু করেছে?

—নিশ্চয় না। তিনি আমার হিতকামী। আমি তাঁর কাছে ঋণী।

—তাহলে তাকে এভাবে বিপদে ফেলছেন কেন? সে আপনাকে কফি-হাউসে যা বলেছে, অথবা যে-ঠিকানা সরবরাহ করেছে....

—জাস্ট এ মিনিট। মিত্রাণী কি কাছেই আছেন?

—আছেন। পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন।

—টেলিফোনটা একবার কাইন্ডলি তাঁকে দেবেন?

—শ্যিওর। নিন, কথা বলুন।

অশোক এক লহমা থেমে 'কথা-মুখে' বলে: মিত্রাণী?

—হ্যাঁ, বলুন?

—আপনাকে সামান্য দু-চার কথা বলব। বেশি কথা বলা ঠিক নয়। প্রথম কথা: কফি-হাউসে আমাদের যে অলোচনা হয়েছে, অথবা পরে যে-ভাবে আমি ব্যক্তি-বিশেষের ঠিকানা সংগ্রহ করেছি. যেসব প্রসঙ্গ আদালতে আদৌ তুলব না। আপনার চাকরির নিরাপত্তা আমাকে দেখতেই হবে, কারণ ঐ অতবড় হৌসে একমাত্র আপনিই এ পর্যন্ত মানবিকতাব পরিচয় দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, আমি ভালো বাড়ি তৈরী করি, মিসেস্ মিত্র, ভালো বাসা ভাঙি না। আরও একটা কথা: আমি যদি আপনাকে এমন প্রশ্ন করি....

আরতি বাধা দিয়ে বলে ওঠে, আপনি তো নন, আপনার তরফে তো সওয়াল করবেন ব্যারিস্টার পি.কে. বাসু! তাঁর সওয়াল যে কী জিনিস....

—না। মিত্রাণী, আপনি ভুল কবছেন। আপনাকে সওয়াল করব আমি নিজে। আই প্রমিস! তাই বলছি, আমি যদি এমন কোন প্রশ্ন করে বসি যার সত্য জবাব দিতে আপনার অসুবিধা হচ্ছে মনে করেন— আই মীন, আপনার চাকরির নিরাপত্তা বিষয়ে, তাহলে আপনি জবাবে বলবেন, 'এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। কারণ তাহলে আমি নিজেই নিজেকে ইনক্রিমিনেট করব'— তাহলেই আমি সতর্ক হয়ে থেমে যাব। একথা বলার স্বাধীনতা সাক্ষীব থাকে, জানেন তো?

—জানতাম না, এখন জানলাম, বেস্ট অব লাক!

—সেম টু য়ু!

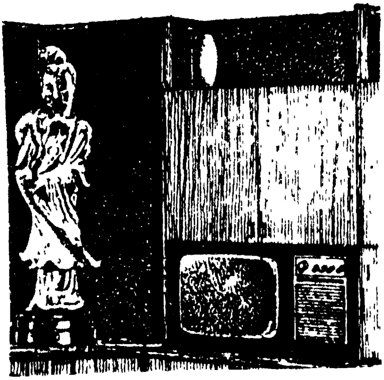

সোমবার, উনত্রিশে জুলাই।

আজই মামলার তারিখ। প্রাতরাশ টেবিলে বসেছে ওরা চারজন—অশোক, অলকা, মালতী আর সিতাংশু।

বুদ্ধিটা অলকার, স্থির হয়েছিল সিতাংশু সাত-সকালে দুই বাচ্চাকে নিয়ে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসবে—দীপু, আর সোমাকে। মিঠুন আজ স্কুলে যাবে না। অশোকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক। সে চায় মিঠুন আদালতে উপস্থিত থেকে সব কিছু দেখুক। সিতাংশু মালতীকে উঠিয়ে নিয়ে এ বাড়িতে আসবে। ওরা হেভি ব্রেকফাস্ট করে এখান থেকেই আদালতে যাবে। সিতাংশু আজ ছুটি নিয়েছে। আদালতে সে সস্ত্রীক উপস্থিত থাকতে চায়। সোমার মা দায়িত্ব নিয়েছেন বারোটা দশে দুটি বাচ্চাকে স্কুল থেকে তাঁর বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। দীপু সোমার সঙ্গে মধ্যাহ্ন আহার সারবে। তারপর আদালত-ফেরত সিতাংশু তার বাচ্চাকে সোমাদের বাড়ি থেকে তুলে নেবে।

অলকা আলুর পরটা বেলে রেখেছে। এ-ছাড়া আছে কাল রাতের লেফ্‌ট ওভার মাছ চচ্চড়ি। স্থির ছিল, ওরা টেবিলে বসলে গরম গরম ভেজে দেবে। কিন্তু মালতী শুনল না। সবগুলোই ভেজে নিয়ে চারজন বসল ডাইনিং টেবিলে।

আহারের অবকাশে স্বভাবতই উঠে পড়ল মামলার প্রসঙ্গ। সিতাংশু বললে, আমি কিন্তু তোর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না, অশোক। বড়মামা যা বলেছিল তাই করলেই ভাল হত। ওদের সান্ডে-সেকশানে ফলাও করে একটা প্রবন্ধ ছাপা হলেই কাজ সারা হয়ে যেত। তুই ওপরপড়া হয়ে কেন যে শচীনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলি....

অশোক বন্ধুকে জানায়নি তার বড়মামার প্রস্তাবটা—ভাগ্নের বন্ধুর খাতিরে সেভেন গ্র্যাণ্ড কমিয়ে ফাইভ করার কেচ্ছা। আড়চোখে সে অলকার দিকে তাকায়। তার মনে পড়ে যায় 'তিন পয়সার পালার' সেই গানটা : ইচ্ছে করলে হাঙরেরও দাঁত দেখতে পাবেন...

মালতী বলল, সে সব তো অতীতের কথা। এখন তা নিয়ে আলোচনা করে কী লাভ? আমি বরং মনে করছি, অশোকদা এখন যে স্টেপটা নিতে যাচ্ছেন সেটাও ভুল!

—কোন স্টেপটা?

—ঐ যে আপনি বলছেন যে, নিজের কেস আপনি নিজেই ডিফেন্ড করবেন! অত বড় ব্যারিস্টার বিনা-ফিতে আপনার হয়ে সওয়াল করতে স্বীকৃত, আর আপনি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছেন।

অশোক গম্ভীরভাবে বলে, অলকারও তাই মত।

সিতাংশু সায় দেয়, ওরা ঠিকই তো বলছে। তুই এই গোঁয়ার্তুমি কেন করছিস?

—কেন করছি, শুনবি? শোন বলি: আমি যেদিন প্রথম 'সঞ্জয় উবাচ' হৌসে যাই সেদিন ভৈরব লাহিড়ীর সঙ্গে আমার কী কথোপকথন হয়েছিল তা তোদের কারও মনে আছে? সেই আমি যখন ওকে বলেছিলাম, 'আমি সামান্য মধ্যবিত্তের মানুষ'.....

মাঝপথেই অশোক থেমে পড়ে। বলে, কী? কারও মনে আছে?

কেউ জবাব দেয় না।

অশোকই তখন বলে, ভৈরব লাহিড়ী তখন বলেছিল— কোট: আজ্ঞে না, মধ্যবিত্তের মানুষ ক্ষুব্ধ হলে প্রতিকার চেয়ে উকিলের চিঠি দেয়। শুধু ধনকুবেররা দেন ব্যারিস্টারের নোটিস, আনকোট!

সিতাংশু বলে, তুই বলতে চাইছিস, ট্রাইং ম্যাজিস্ট্রেট ধরে নেবে তোর অগাধ সম্পত্তি...

—ন্যাচারালি! সামান্য একটা অ্যাসল্ট কেস-এ কেউ ব্যারিস্টার এনগেজ করে না—ধনকুবের না হলে। বিচারক তো জানছেন না যে, পি.কে.বাসু. বার-অ্যাট-ল একটি পয়সা ফি না নিয়ে কেস লড়ছেন। তার নীট ফল কী? আমাকে শেষ পর্যন্ত গিলটি প্লীড করতে হবেই...

—এই যে বললি, তুই নট-গিলটি প্লীড করবি।

—ঠিকই বলেছি। প্রাথমিক পর্যায়ে। আমি যাই প্লীড করি—এটা তো ঠিকই যে, আমি আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলাম। আমি সত্যভ্রষ্ট হইনি। নীতিভ্রষ্ট হইনি কিন্তু বেআইনি কাজ করেছি। আমি যতই অত্যাচারিত হই, যতই উত্তেজিত হই—আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারি না। বিচারক আমাকে 'দোষী' বলে চিহ্নিত করতে বাধ্য! সেক্ষেত্রে আমার জরিমানার পরিমাণটা নির্ণীত হবে আমার আর্থিক সঙ্গতির বিবেচনায়। সেকেন্ডলি, আমি ঐ মিসেস্ আরতি মিত্রের উপদেশটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

—আরতি মিত্রের উপদেশ! তার মানে? সে আবার তোকে কী উপদেশ দিল? কখন?

—না। মিসেস মিত্র আদৌ কোন উপদেশ দেননি। তিনি একটা উদ্ধৃতি শুনিয়েছিলেন মাত্র। যখন আমি তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে, 'ভৈরববাবু আমাকে তিনটি অলটারনেটিভ দিয়েছেন—'খুন-জখম-আত্মহত্যা'—আমার কোনটা করা উচিত। উনি সেই সময় বাইবেল-এর একটা উদ্ধৃতি আমাকে শুনিয়েছিলেন। খুবই প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি: 'এভরি-ওয়ান হ্যাজ টু বিয়ার ওয়ানস ঔন ক্রস্!' আমার ক্রুশকাঠখানা আমাকেই বইতে দে, সিতাংশু!

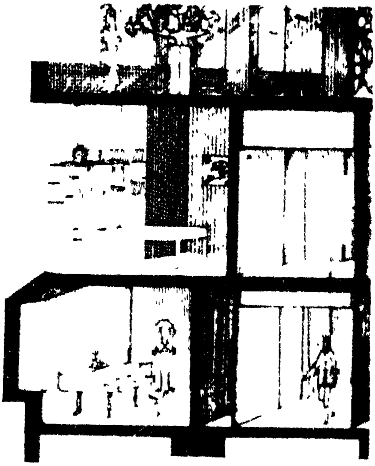

কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময় অশোক মুখার্জী জামিনের নির্দেশ মোতাবেক আদালতে আত্মসমর্পণ করল। থানার ও. সি. দেখতে পেয়ে বললেন, খোকাকেও নিয়ে এসেছেন দেখছি। বসুন, এধারে। আপনার ব্লু-বুক আর লাইসেন্সটা ফেরত নিন। এই খাতায় সই করুন আর রসিদটা দিন।

অশোক নিজের গাড়িতেই এসেছে, অলকাকে নিয়ে। সিতাংশু আর মালতীও এসেছে মামলা শুনতে। মিঠুন তো আছেই।

একটু পরেই ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব এসে আসন গ্রহণ করলেন। আদালতের উপর নজর বুলিয়ে একটু বিস্মিত হলেন, কারণ আদালত কক্ষ দর্শকে ঠাসা! কেন? কী ব্যাপার? কোর্ট নকিব ঘোষণা করল প্রথম মামলার নাম: পশ্চিমবঙ্গ সরকার বনাম অশোক মুখার্জী।

অশোক এগিয়ে গেল। পাবলিক প্রসিকিউটার চার্জটা দাখিল করলেন। মামলার নথীপত্র দেখে ম্যাজিস্ট্রেট প্রভাস ধর একটু বিস্ময় প্রকাশ করলেন মনে হল। চশমার উপর দিয়ে ডিফেন্স বেঞ্চ-এর দিকে তাকিয়ে দেখলেন। হ্যাঁ, পি. কে. বাসু, বার অ্যাট-ল গাউন চাপিয়ে বসে আছেন।

বিচারক জানতে চান, আপনি ওকালতনামা দাখিল করছেন দেখছি! আসামীর তরফে আপনি সওয়াল করবেন?

—নো, য়োর অনার। আমি ওঁর লীগ্যাল অ্যাডভাইসার মাত্র। ওঁর কেস উনি নিজেই আর্গু করতে চান।

—দ্যাটস্ ভেরি ইন্টারেস্টিং!

বটেই তো! এই সামান্য 'অ্যাসল্ট'-এর মামলায় কেউ ব্যারিস্টার দেয় না, যদি না তার উপাধি বিড়লা, ডালমিয়া, বা খৈতান হয়। আবার ব্যারিস্টার এনগেজ করেও কেউ নিজে সওয়াল করতে চাইতে পারে এ যে ভাবাই যায় না।

ধর-সাহেব আসামী অশোক মুখার্জীকে সরাসরি প্রশ্ন করেন, আপনি নিজের

কেস নিজেই কনডাক্ট করতে চান ?

—উইথ যোর কাইন্ড পার্মিশান, ইয়েস, য়োর অনার !

——আর অ্যাডভোকেট ঘোষ-সাহেব ? আপনি কাকে রিপ্রেজেন্ট করছেন ? 'সঞ্জয় উবাচ' ? কেস হচ্ছে স্টেট ভার্সেস মুখার্জীর। এখানে 'সঞ্জয় উবাচ'র তো কোন ভূমিকা নেই ?

অ্যাডভোকেট মহেন্দ্রনাথ ঘোষ উঠে দাঁড়িয়ে একটা বাও করেন। বলেন, 'সঞ্জয় উবাচ'র প্রসঙ্গ যদি মামলায় না ওঠে তবে আমি দর্শক মাত্র।

—বুঝলাম। পি. পি. আপনি শুরু করতে পারেন।

পাবলিক প্রসিকিউটার মামলার বিষয়বস্তুটা প্রথমে হুজুরকে বুঝিয়ে দিলেন। আসামী অশোক মুখার্জী একজন সিভিল আর্কিটেক্ট। এই শহরের বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার চৌঠা জুলাই তিনি আলিপুর আদালত-ভুক্ত একটি হাউসিং এস্টেটে একলা খালি হাতে গিয়ে এল বাই-ওয়ান এম. আই. জি. কোয়ার্টার্সে বেল বাজান। গৃহস্বামী শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাশশর্মা দরজা খুলে জানতে চান, আগন্তুক কী প্রয়োজনে এসেছেন। এরপর দু-একটা কথা-কাটাকাটির পরই আগন্তুক শ্রী মুখার্জী গৃহস্বামীর নাকে হঠাৎ একটা ঘুষি মেরে বসেন। এ ঘটনা ঐ বাড়ির দ্বারপথে ঘটে। শচীনবাবুর নাক দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে, তিনি দ্রুত দরজাটা বন্ধ করে দেন। তখন আসামী থানায় যান এবং একটি এফ. আই. আর. লজ করেন....

ম্যাজিস্ট্রেট বাধা দিয়ে বলেন, পরিষ্কার করে বলুন, মশাই। ক্রিয়াপদের কর্তা কোন্ জন ? কে এফ. আই. আর. লজ করেন ?

পি. পি. কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে বলেন, আসামী স্বয়ং। তাঁর মতে একটা assault হয়েছে, তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন, তাই থানায় এজাহার দিতে এসেছিলেন....

ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব একবার আসামী একবার পি. পি. কে দেখে নিয়ে আসামীকেই প্রশ্ন করেন, উনি যা বলছেন তা সত্যি ?

তড়াক করে উঠে দাঁড়ায় অশোক। বলে, মোটামুটি সত্য। তবে ডিটেল্‌সে কিছু গলতি আছে। তা মামলা চলাকালে শুধরে নেওয়া যাবে হুজুর !

—কী গলতি আছে ?

—এক নম্বর : আসামী ডোর-বেল বাজানোর পর দরজা খুলে দেন গৃহস্বামী নন, মিসেস্ দাশশর্মা। দ্বিতীয়ত আসামী একলা যাননি, সঙ্গে তাঁর নাবালক পুত্র ছিল। তৃতীয়ত তিনি খালি হাতেও যাননি, তাঁর হাতে 'সঞ্জয় উবাচ' কাগজের একটা পেপার-কাটিং ছিল। চতুর্থত....

—তা বলছি না। আপনি মিস্টার দাশশর্মার নাকে বেমক্কা একটা ঘুষি মেরেছিলেন ?

—সেটাই তো এ মামলার বিচার্য বিষয়, য়োর অনার !

—মিস্টার দাশশর্মা আপনাকে কোন আঘাত করেননি ?

—নো, যোব অনার !

—ওঁকে ঘুষি....আই মীন ওঁর নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে শুরু করার পর উনি আপনাকে কোনও গালমন্দ করেছিলেন ?

—আজ্ঞে না। উনি শুধু বলেছিলেন : আঁ---ক! সেটা গাল নয়।

—আর তারপর আপনি থানায় গিয়ে এফ. আই. আর. লজ করলেন ?

—করলাম।

—কেন ? কাব বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ ?

—'কার বিরুদ্ধে অভিযোগ' সেটা তো পুলিসে বিচার করবে, য়োর অনার। আমি তো এজাহারে শুধু স্বচক্ষে দেখা ঘটনাব বিবরণ দিয়েছি মাত্র। একটা 'কেস অফ্ অ্যাসল্ট' স্বচক্ষে হতে দেখলাম। একজন ল-অ্যাবাইডিং সিটিজেন হিসাবে থানায রিপোর্ট না করাটা আমার 'অনাগবিকোচিত' ব্যবহার হত না কি ?

ম্যাজিস্ট্রেট ওর দিকে স্থির দৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন।

তাবপর পি. পি-কে বললেন, প্রিলিমিনারি থাক। চার্জ শোনান।

'অ্যাসল্ট চার্জ'-এব ধারা মোতাবেক বাঁধা বযান পড়ে গেলেন পি. পি.।

ম্যাজিস্ট্রেট অশোককে প্রশ্ন কবেন, এবার বলুন, আপনার 'প্লী' কী ? 'দোষী' না 'নির্দোষ' ?

—আমি নির্দোষ হুজুর।

—অল রাইট। পি. পি. আপনি আপনাব প্রথম সাক্ষীকে ডাকতে পারেন।

প্রথম সাক্ষী মিসেস্ দাশশর্মা। পি. পি.-র প্রশ্নে সে জানালো যে, অশোক মুখার্জী প্রথম আবির্ভাবে একটা ছলনাব আশ্রয় নিয়েছিল। যেন সে দাশশর্মাকে দীর্ঘদিন ধরে চেনে। তাই জিজ্ঞাসা করেছিল, 'শচীনদা কি আছেন, না বাজারে বেরিয়ে গেছেন ?' অথচ একটু পরে, আসামী তার স্বামীকে প্রশ্ন করে, 'আপনার নাম কি শচীন দাশশর্মা' ? তখন সাক্ষী অবাক হয়ে যায়।

অশোক মেয়েটিকে কোন জেরা করল না।

পুলিসের দ্বিতীয় সাক্ষী ইন্সপেক্টর জয়ন্ত ঘোষাল।

সে তার এজাহার দিল। চৌঠা জুলাই সকাল সাড়ে আটটায় রাস্তার মোড়ে আসামী অশোক মুখার্জী একটা বাচ্চা ছেলের হাত ধরে এগিয়ে আসে। বলে, সামনের বাড়িতে একটা 'কেস অব অ্যাসল্ট' হয়েছে। পি. পি. র প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে জয়ন্ত থানায় এসে উপস্থিত হল। এবং সেখানেই ওর এজাহার থামল।

পি. পি. অশোকের দিকে ফিরে বললেন, যোর উইটনেস্!

অশোক তাকে প্রশ্ন করে, সার্জেন্ট ঘোষাল, আমরা যখন এল-বাই ওয়ান কোয়ার্টার্সে এসে কলবেল বাজালাম তখন দোর খুলে দিল কে ?

—মিসেস্ দাশশর্মা।

—তাঁকে প্রথম সম্বোধন কে করেছিল এবং কী ভাষায় করেছিল তা কি আপনার

মনে আছে? থাকলে বলুন?

—আপনিই তাঁকে প্রথম সম্বোধন করেন। ইফ আই রিমেমবার কারেক্টলি, আপনি বলেছিলেন, 'মিসেস্ দাশশর্মা? শচীনদাকে একবার ডেকে দিন কাইণ্ডলি। এই পুলিস-সার্জেন্টটি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চান।'

—কারেক্ট। আমি 'শচীনদা' বলেছিলাম এটা আপনার স্পষ্ট মনে আছে? শচীনবাবু অথবা মিস্টার দাশশর্মা নয় তো?

—না। আপনি 'শচীনদা' বলেছিলেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে।

—তা থেকে কি আপনার ধারণা হয়েছিল শচীনবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভাল?

পি.পি. আপত্তি তোলেন। সাক্ষীর ধারণা কোনও এভিডেন্স নয়।

অশোক যুক্তি দেখায়, সাক্ষী একজন পুলিস সার্জেন্ট। অপরাধ-বিজ্ঞানে বিশেষ শিক্ষিত। তাঁর বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রাহ্য হওয়া উচিত।

বিচারক অবজেকশান ওভাররুল করলেন।

জয়ন্ত বঙ্গল, তখনো আমি জানতাম না যে, ঘুষিটা আপনিই মেরেছেন। তাই আমি ধরে নিয়েছিলেম, শচীনবাবুব সঙ্গে আপনাব প্রীতির সম্পর্ক, অনেকদিনেব জানাশোনা। সে জন্যই আহত মানুষটির পক্ষে আপনি পুলিস ডাকতে গেছিলেন। তাঁকে 'শচীনদা' বলছেন।

---দ্যাটস্ অল, য়োর অনার।

তৃতীয় সাক্ষী থানার ও. সি. সুধীর বসু।

পি. পি.-র প্রশ্নে তিনি স্বীকার করলেন: আসামী তাঁকে এজাহার লেখাতে বাধ্য করে। তিনি শচীন দাশশর্মাকে বাড়িতে ফোন করে জানতে পারেন যে, আক্রান্ত ব্যক্তি কেস চালাতে ইচ্ছুক নন। কিন্তু আসামীর জেদাজেদিতে তিনি কেস-ডায়েরি করেন।

—দ্যাট্স অল, য়োর অনার।

এবার অশোক জেরা শুরু করল, আপনি কতদিন পুলিসে চাকরি কবছেন এবং কতদিন থানার ও. সি. হয়ে আছেন, সুধীববাবু?

—আঠারো বছর পুলিস বিভাগে, আর ছয় বছর ও.সি. হিসাবে।

—এই দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় আপনি কয়টি কেস জানেন, যেখানে কোন পত্রিকার সাংবাদিককে কেউ বাড়িতে চড়াও হয়ে ঠেঙিয়েছে?

—আমি এমন কেস আগে একটিও পাইনি।

—এমন কেস কয়টি পেয়েছেন যেখানে কোনও গৃহস্বামীকে—সে যে-কোন প্রফেশানেরই হোক—এক বে-পাড়ার আগন্তুক নাকে দ্রাম করে ঘুসি মারল আর তিনি চিৎকাব চেঁচামেচি করলেন না, লোক জড়ো করলেন না, শুধু দরজা বন্ধ করে নাকে ভিজে তোয়ালে চেপে ধরলেন?

—আমি এমন কেসও আগে পাইনি।

—এবার অনুগ্রহ করে হুজুরকে বলুন, আপনার দীর্ঘ আঠারো বছরের পুলিস জীবনে এমন অ্যাসল্ট কেস কয়টা পেয়েছেন, যেখানে অ্যাসল্টকারী স্বয়ং থানায় এসেছে কেস ডায়েরী লেখাতে?

সাক্ষী প্রশ্নমাত্র জবাব দিলেন, একটাও না!

—এবার অনুগ্রহ করে বলুন, অভিযুক্ত ব্যক্তির অতীত জীবন ঘেঁটে কি দেখেছেন যে, তাঁকে কখনো কোনও অভিযোগে গ্রেপ্তার অথবা অভিযুক্ত করা হয়েছিল কি না?

—এটা একটা রুটিন কাজ। অ্যাসল্ট কেস-এ দেখতেই হয়। আজ্ঞে না, আসামীর বিরুদ্ধে আগে কখনো মারামারি বা অ্যাসল্টের অভিযোগের খবর নেই।

—আপনি কেস-ডায়েরি লেখার আগে মিস্টার দাশশর্মাকে ফোন করে জানতে চেয়েছিলেন তাঁর কোনও অভিযোগ আছে কিনা—একথা আপনি ডাইরেক্ট এভিডেন্সে বলেছেন। এবার আপনি বলুন, মিস্টার দাশশর্মা এ-কথা কি বলেছিলেন যে, 'সঞ্জয় উবাচ' পত্রিকাও এ মামলা চালাতে চায় না? আপনি আমাকে সে-কথা বলেছিলেন কি?

চট করে উঠে দাঁড়ান মহেন্দ্র দত্ত, অবজেকশন, যোর অনার! ইররেলিভেন্ট অ্যান্ড ইম্মেটিরিয়াল। মিস্টার শচীন দাশশর্মার কোনও অথরিটি নেই ও কথা বলার! এসব 'হেয়ার-সে'!

অশোক বিচারকের দিকে ফিরে বলে, য়োর অনার! এটাকে মাননীয় কাউন্সেল কী করে 'হেয়ার-সে' বলছেন তা আমার বোধের অগম্য। কথাটা বলেছেন থানার ও. সি., থানা-প্রেমিসেসে, আসামীর উপস্থিতিতেই শুধু নয়, আসামীকে সম্বোধন করে! এটা 'হেয়ার-সে'? আর 'ইররেলিভেন্ট অ্যাণ্ড ইম্মেটিরিয়াল' কি না, তা একটু পরেই বোঝা যাবে। ডায়রেক্ট এভিডেন্সে বাদীপক্ষের সাক্ষী সার্জেন্ট জয়ন্ত ঘোষাল স্বীকার করেছেন যে, আসামীর হাতে একটা পেপার কাটিং ছিল: 'সঞ্জয় উবাচ'র।

বিচারক বললেন, অবজেকশান ওভারক্লড্।

—হ্যাঁ, মিস্টার দাশশর্মা আমাকে টেলিফোনে জানিয়েছিলেন যে, উনি বা ওঁর এমপ্লয়ার কোনও অভিযোগ দায়ের করতে চান না।

—সেটা আপনার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর মনে হল না কি? ইস্টার্ন-ইন্ডিয়ার অত বড় নামকরা পাব্লিকেশন হৌসের একজন নিজস্ব সংবাদদাতা নিজের বাড়িতে কিল খেলে কিল চুরি করছে, এটা তাজ্জব বলে মনে হয়নি আপনার?

—অবজেকশান! ইররেলিভেন্ট!— গর্জে ওঠেন মহেন্দ্র।

—ওভারক্লড!—বিধান দেন বিচারক।

—হ্যাঁ! আমার কাছে খুবই বিস্ময়ের মনে হয়েছিল।

—অল রাইট! এ-কথা কি সত্য যে, থানায় আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—“ওঁকে ঠেঙাবেন বলেই যখন বাড়ি থেকে বের হন, তখন এই দুধের বাছাকে কেন সঙ্গে নিয়ে এসেছেন?”

—হ্যাঁ, সত্যি।

—জবাবে আমি যা বলি তা কি আপনি কেস ডায়েরিতে লিখে নিয়েছিলেন?

—না। ও কন্‌ভারসেশন ‘অফ-দ্য-রেকর্ড’ হয়েছিল। আপনি খোকাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে বলায় আমি ঐ প্রশ্ন করি আর আপনি জবাব দেন।

—অলরাইট! এবার বলুন, জবাবে আমি কী বলেছিলাম, রেকর্ড করুন বা না করুন।

এবার অবজেকশান দিলেন পি. পি.: ইর্‌রেলিভেন্ট।

একই যুক্তি দেখালো অশোক। সাক্ষী গ্রামের নিরক্ষর কৃষক নন, থানা-ইন-চার্জ। আলোচনা হয়েছে থানার ভিতর, আসামীর সঙ্গে। এটা অপ্রাসঙ্গিক হয় কী করে? বিচারক সে যুক্তি মেনে নিলেন।

ও. সি. বললেন, জবাবে আপনি দুটি যুক্তি দেখিয়েছিলেন। এক নম্বর: বলেছিলেন বাড়ি থেকে যখন বার হন, তখন আপনার আশঙ্কা ছিল না যে, মিস্টার দাশশর্মাকে আপনি ঘুষি মারবেন। আপনি নাকি ওঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন বোঝাতে যে, ‘সঞ্জয়-উবাচ’ পত্রিকায় পরিবেশিত একটা ভ্রান্ত সংবাদে আপনার প্রচণ্ড ক্ষতি হচ্ছে। তার ফলে আপনার খোকার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে কেউ। মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা খোকাকে দেখলে ওঁর করুণা হবে ভেবেছিলেন, তাই ওকে নিয়ে গেছিলেন।

—আর দ্বিতীয় যুক্তিটি কী দেখিয়েছিলাম আমি?

—আপনি ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন খোকাকে শেখাতে যে অন্যায় করার মতো অন্যায় সহ্য করাও অন্যায়!

—থ্যাঙ্ক, অফিসার, ফর য়োর ইম্পার্শিয়াল এভিডেন্স!

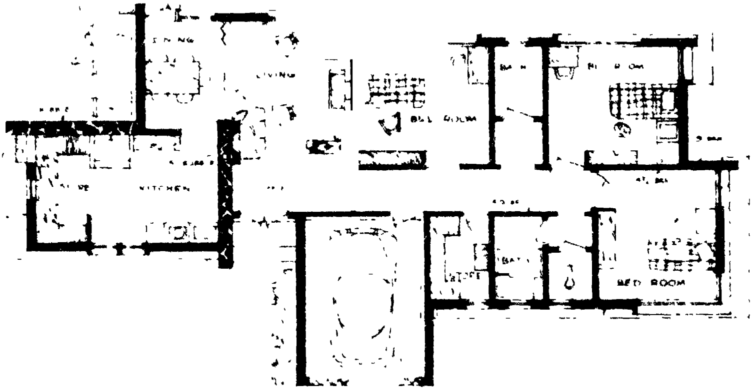

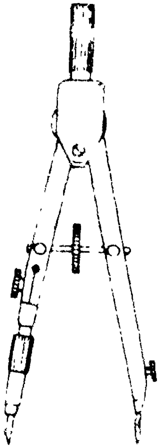

পি. পি. উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এবার আমার স্টার উইটনেস্ শচীন দাশশর্মা—যিনি অ্যাসল্টেড।

শচীন উঠে দাঁড়িয়ে হলফ-নামা পড়ল। তার নাকে কোন ব্যান্ডেজ আর নেই এখন। হলফনামা পাঠ শেষ হতে পি. পি. প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সাক্ষীর নাম-ধাম-প্রফেশনের প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপর এলেন চৌঠা জুলাই সকালের প্রসঙ্গে। শচীন জানালো সকাল আটটা-নাগাদ সে যখন খবরের কাগজ পড়ছে তখন কেউ কলবেল বাজায়। ওর স্ত্রী সদর দরজা ঘুরে এসে বলে যে, 'সঞ্জয় উবাচ' অফিস থেকে কেউ এসেছে। লোকটা অচেনা, তবে 'শচীনদা' বলে ডাকছে যখন, তখন অফিসের কোন জুনিয়ার স্টাফ হবে। শচীন এগিয়ে এসে দ্বার খোলে। আগন্তুক নিজের পরিচয় দেয়। মাসখানেক পূর্বে 'সঞ্জয় উবাচ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটা নিউজ আইটেমের বিষয়ে সে প্রতিবাদ জানাতে চায়। সাক্ষী আগন্তুককে বলে, সব ব্যাপারেরই একটা 'প্রপার চ্যানেল' আছে। সে আসামীকে ফর্মাল চিঠি লিখতে বলে। কিন্তু আসামী সে কথায় কর্ণপাত করে না। জোর করে ঘরে ঢুকে তার প্রতিবাদ জানাতে চায়। এ সময় কিছু কথা কাটাকাটি হয়—বিস্তারিত তার মনে নেই। এমন সময় হঠাৎ আসামী তার নাকে ঘুষি মারে। শচীন দরজা বন্ধ করে দেয়। তার মিনিট পনের পর ঐ আসামী ফিরে আসে সার্জেন্ট জয়ন্ত ঘোষাল সহ। কিছু কথাবার্তা হয়। তারও প্রায় আধঘণ্টা পরে থানা থেকে ও.সি. ফোন করে জানতে চান ব্যাপারটা সম্বন্ধে। সে ও.সি.-কে আদ্যন্ত সত্য কথা বলে। এবং জানায় যে, সে মামলা চালাতে ইচ্ছুক নয়।

—য়োর উইটনেস্! —পি. পি. অশোককে বলেন।

—আপনার নিশ্চয় মনে আছে, দরজা খুলে আপনি দেখেন আমার সঙ্গে একটি ছোট ছেলে আছে, যার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা?

—আমার মনে নেই।

—আপনার এ-কথা কি মনে আছে যে, আমি বলেছিলাম, 'আপনার ভুল

খবরেব জন্য আমার ছেলের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে'...আপনি তাতে বাধা দিয়ে বলেছিলেন 'আপনার ছেলের প্রসঙ্গ আসছে কোথা থেকে?' আর আমি বলেছিলাম, 'সে কথা বলব বলেই তো এসেছি। ভিতরে এসে বসতে দিন আগে....'

— ঠিক কী কী কথোপকথন হয়েছিল তা আমার মনে নেই।

—-আমার হাতে সে সময় 'সঞ্জয়-উবাচ'র একটা কাটিং ছিল এটা কি আপনার মনে আছে?

— থাকতে পারে।

—-থাকতে তো অনেক কিছুই পাবে, শচীনদা। আপনাব জ্ঞানমতে ছিল, এবং সেটা আমি আপনাকে দেখিযে বলেছিলাম এই নিউজটার সম্বন্ধে আমি আলোচনা কবতে এসেছি— তাই নয?

— আমি তো আগেই বলেছি, ঠিক কী কী কথা হযেছিল আমার মনে নেই। এটুকু মনে আছে যে, আপনাব সঙ্গে আমার কথা-কাটাকাটি হয়েছিল।

—আপনি বাংলা শর্টহ্যান্ডে নোট নিতে জানেন?

মহেন্দ্র দত্ত অবজেকশান দাখিল করেন; অপ্রাসঙ্গিক।

বিচারক অশোকের কাছে প্রশ্নটির প্রাসঙ্গিকতা জানতে চাইলেন।

অশোক বলে, য়োর অনার! সাক্ষী একটি বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা। মন্ত্রী, বিধাযক, খেলোয়াড় প্রভৃতির সঙ্গে প্রেস-মিটিং অ্যাটেন্ড করাই এঁর পেশা। শুনে এসে পরে রিপোর্টিং করেন। আমি জানতে চাইছি যে, উনি বাংলা শর্টহ্যান্ড নিতে জানেন কিনা। যদি না জানেন, তাহলে সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে, উনি সজ্ঞানে এখানে সত্য গোপন করছেন। ওঁর স্মৃতিশক্তি এত দুর্বল হতেই পারে না যে, মনে থাকবে না পনের দিন আগে কোন্ কাটিংটা আমি ওঁকে দেখিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে মাথায়-ব্যান্ডেজ একটি ছেলে ছিল কিনা।

—অবজেকশান ওভাররুলড্। আনসার দ্যাট কোশ্চেন।

—না, আমি বাংলা শর্টহ্যান্ড জানি না।

—অল রাইট! আপনার কি অন্তত এটুকু মনে আছে যে, আমি আপনাদের নিউজ এডিটার মিস্টার ভৈবব লাহিড়ীর নাম উচ্চারণ করেছিলাম?

সাক্ষী একটু ভেবে নিয়ে বলল, হ্যাঁ, তাঁর নামে কী-যেন বলেছিলেন।

—আমি বলেছিলাম, ''আপনাদের নিউজ এডিটার আমাকে বলেছেন, আপনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন—খুন-জখম-আত্মহত্যা। শুধু আমাদের জ্বালাতে আসবেন না।''—বলেছিলাম? মনে পড়ে?

—না!

—না? অথচ আপনি জবাবে বলেছিলেন, 'ঠিকই তো বলেছেন ভৈববদা!' আর তৎক্ষণাৎ আমি আপনার নাকে ঘুষিটা বসিয়ে দিই! তাই না?

—না!

পি. পি. তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, য়োব অনার! আসামী নিজ মুখে এইমাত্র স্বীকার করেছেন যে, ঘুষিটা উনিই মেরেছিলেন! এরপর ওঁর নট-গিল্‌টি প্লী....

অশোক বাধা দিয়ে বলে, কিন্তু আপনার স্টার উইটনেস্‌ যে আর্তনাদ করে উঠল: না!!

ম্যাজিস্ট্রেট জানতে চান পুলিসপক্ষের আর কোন সাক্ষী আছে কিনা। পি. পি. জানালেন নেই। এবার তিনি অশোকের কাছে জানতে চাইলেন, ডিফেন্সের কোন সাক্ষী আছে কি না। অশোক জানালো আছে।

নকিব প্রতিবাদীর পক্ষে প্রথম সাক্ষীর নাম ডাকল।

বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে সাক্ষীর মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন রামশরণজী। তাঁর এজাহারে তিনি জিজ্ঞাসিত হয়ে জানালেন যে, 'অখ্‌বরে' প্রকাশিত সংবাদে তিনি জেনেছিলেন সন্দীপ ধনপতিয়ার অধঃপতিত প্রাসাদের আর্কিটেক্ট হচ্ছেন অশোক মুখার্জী। তাঁকে পুলিসে খুঁজছে এবং তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। পরদিন তিনি মুকুরজি-সাবকে টেলিফোন করে জানিয়ে দেন যে, ডায়মন্ডহারবারে সিনেমা হল বানাবার জন্য তিনি অন্য আর্কিটেক্ট নিয়োগ করতে ইচ্ছুক।

—যেহেতু আমি পুলিস কেসে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি?

—হাঁ-সা'ব, হামি ঐ রকম সোচিয়েছিলাম্‌।

—কোন কাগজে ঐ খবরটা বার হয়? আপনি কি সেটা সঙ্গে করে এনেছেন?

রামশরণ নির্দেশমতো তা সঙ্গে করে এনেছিলেন। অশোকের আর্জি মোতাবেক তা ডিফেন্সের এক্সিবিট হিসাবে নথীভুক্ত করা হল।

অশোকের অনুরোধে রিপোর্ট-এর লাল-কালি দিয়ে চিহ্নিত অংশটা পড়েও শোনানো হল আদালতে—যেখানে বলা হয়েছে পুলিস মধ্যরাত্রে অশোক মুখার্জীর বাড়িতে হানা দেয়।

অশোক প্রশ্ন করে, রামশরণজী, আপনি আমার কাজ কেড়ে না নিলে আমার বিল কত টাকার হত বলে আপনার ধারণা?

—হমার বিচারে পন্দের-বিশ হজার—সুপারভিশন বাদে!

—দ্যাটস্‌ অল য়োর অনার।

বাদীপক্ষ ওঁকে ক্রস করল না। সাক্ষীর মঞ্চ থেকে নেমে দাঁড়ালেন রামশরণজী। একটু ইতস্তত করলেন, তারপর এগিয়ে এসে অলকাকে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললেন, কল সুবে হামি ফোন করিবে। মুকুরজি সা'বকে বোলিয়ে দিবেন। সিনেমা-হৌস উনিই বনাইবেন!

রামশরণজীর গাড়ি করেই অলকা, মিঠুন আর অশোক ডায়মণ্ড-হারবার গিয়েছিল। বোধ করি রামশরণ বুঝতে পেরেছে, অশোক চোর-পুলিস খেলছে না।

পরবর্তী সাক্ষী সিটি-আর্কিটেক্টের বড়বাবু।

প্রতিবাদী পক্ষের ব্যারিস্টারের চাহিদা মতো সে ধনপতিয়ার ভেঙে-পড়া বাড়ির চারতলা প্ল্যানের অ্যাটেস্টেড কপি দাখিল করল এবং মুখার্জী অ্যাণ্ড আসোসিয়েটস্ যে সুপারভিশান কাজ করবে না বলে চিঠি দিয়েছিল তারও অ্যাটেসটেড কপি।

পি. পি. বারে-বারে আপত্তি জানাতে থাকেন—এসবই অপ্রসাঙ্গিক। আর অশোক যুক্তি দেখাতে থাকে: একজন 'ল-অ্যাবাইডিং সিটিজেন' হঠাৎ কেন একজন লোককে ঘুষি মেরে বসল এটা বুঝে নিতে হলে পশ্চাদপটের ঘটনা প্রাসঙ্গিক।

বিচারকও ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারছিলেন সেটা।

এবার সাক্ষী দিতে এলেন একজন পুলিস ইন্সপেক্টার। তিনিও বাসু-সাহেবের সমন পেয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। সাক্ষ্যে তিনি জানালেন, সন্দীপ ধনপতিয়ার ভেঙে-পড়া বাড়ির বিষয়ে তিনিই তদন্তকারী অফিসার। সেই ভেঙে-পড়া বাড়ির আর্কিটেক্ট রাকেশ ভার্মা। সে পলাতক। মিস্টার অশোক মুখার্জীর বিরুদ্ধে কোনও এনকোয়ারি কোন দিন হয়নি। বা তার বিরুদ্ধে পুলিসের কোন অভিযোগ নেই বা ছিল না।

পরবর্তী সাক্ষীর নাম ঘোষণা করল পেশকার: ভৈরব লাহিড়ী হাজির?

চীফ নিউজ এডিটার ভৈরব সাক্ষী দিতে মঞ্চে উঠে দাঁড়ালো। প্রশ্নের মাধ্যমে নাম ও পরিচয় প্রতিষ্ঠা করে অশোক জানতে চাইল: আপনার সঙ্গে আমার টেলিফোনে তিনবার কথা হয়, তাই না?

—আমার মনে নেই।

—টেলিফোনে আমার সঙ্গে জীবনে কখনো কোন কথা বলেছেন?

—আমার মনে নেই।

অশোক বিচারকের দিকে ফিরে বলে, য়োর অনার! সাক্ষী হোস্টাইল, আদালতের সহযোগিতা করতে অনিচ্ছুক, এটা তাঁর প্রথম দুটি জবাবেই বোঝা যাচ্ছে। আমি ওঁকে হোস্টাইল-উইটনেস্ হিসাবে ঘোষণা করার আর্জি জানাচ্ছি এবং লীডিং কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করার অনুমতি প্রার্থনা করছি।

বিচারক বললেন, ইয়েস, দ্য উইটনেস্ অ্যাপিয়ার্স টু বি হোস্টাইল। আপনি ওঁকে লীডিং কোশ্চেন করতে পারেন।

অশোক সাক্ষীকে প্রশ্ন করে, মিস্টার লাহিড়ী, আপনি ঠিক কখন জানতে পারেন যে, মিস্টার শচীন দাশশর্মা আপনাকে ভুল খবর দিয়েছিলেন—অর্থাৎ পুলিস যে আর্কিটেক্ট-এর বাড়ি রেইড করে সে অশোক মুখার্জী নয়?

ভৈরব লাহিড়ী অসহায়ভাবে মহেন্দ্রবাবুর দিকে তাকান; কিন্তু তিনি কোনও অবজেকশান দাখিল না করায় জবাবে ভৈরববাবু বলেন, ব্যারিস্টার পি. কে. বাসুর চিঠি পাওয়ার পর।

—ভুলটা বুঝতে পেরে একটা সংশোধিত নিউজ-আইটেম ছাপতে পাঠালেন

না কেন ?

—সেটা কাগজের ইন্টার্নাল ব্যাপার। আপনার এ মামলার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

—আমি যখন টেলিফোনে আপনার সঙ্গে অফিসে দেখা করতে চাইলাম তখন আপনি রাজি হলেন না কেন ?

—আমিও তো আপনাকে টেলিফোনে বললাম, লেটার্স টু দি এডিটার কলামে চিঠি লিখে আপনার বক্তব্য জানাতে।

—আপনি কয় পেগ হুইস্কি গিলে সাক্ষী দিতে এসেছেন ?

এবার মহেন্দ্র দত্ত হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন : অবজেকশান।

অশোক ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে ফিরে বলে, য়োর অনার, তিন মিনিট আগে আমার প্রশ্নের জবাবে উনি বলেছেন যে, আমার সঙ্গে টেলিফোনে জীবনে কখনো কথা বলেছেন বলে ওঁর মনে পড়ে না। আর এইমাত্র বললেন যে, উনি টেলিফোনে আমাকে কিছু বলেছেন। ফলে, দুটো সিদ্ধান্তের একটি কাউন্সেল মিস্টার দত্ত নিশ্চয় মেনে নেবেন—হয় উনি যে-কাগজের স্বার্থ দেখতে নিযুক্ত তার চীফ নিউজ এডিটার মত্তাবস্থায় বর্তমানে সাক্ষী দিচ্ছেন, অথবা তিনি সজ্ঞানে মিথ্যাসাক্ষ্য দিচ্ছেন এবং পার্জারীর মামলার আসামী হতে প্রস্তুত। মাননীয় কাউন্সেল কোনটা বেছে নিচ্ছেন জানলে আমি পরবর্তী পদক্ষেপ বিষয়ে চিন্তা করতে পারি।

মহেন্দ্র নিরুত্তর।

ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষীকে বলেন, আপনি সত্য জবাব দিন। সজ্ঞানে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে আপনাকে পার্জারী-মামলার আসামী হতে হবে। এ বিষয়ে আপনাকে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে। য়ু মে প্রসীড মিস্টার মুখার্জী, বাট প্লীজ বি ব্রীফ !

—ইয়েস, য়োর অনার !

সাক্ষীকে বলে, টেলিফোনে আপনি আমাকে বলেছিলেন, ''আপনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন—খুন-জখম-আত্মহত্যা—শুধু আমাদের অফিসে জ্বালাতে আসবেন না !''—মনে পড়ে ?

—আমি ও-কথা বলিনি।

—আপনাকে আদালত সাবধান হতে বলেছেন। আপনি তবু মিথ্যা সাক্ষী দিচ্ছেন কেন ?

—আপনি আমাকে হুমকি দেবেন না। আমি মিথ্যা সাক্ষী দিচ্ছি না।

অশোক বিচারকের দিকে ফিরে বলল, য়োর অনার, এই পর্যায়ে আমি এই মদ্যপ অথবা মিথ্যাবাদী সাক্ষীর প্রশ্নোত্তর সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে অন্য একজনকে তলব করতে চাই—

মহেন্দ্র দত্ত আপত্তি জানান, কিন্তু বিচারক অনুমতি দিলেন।

অশোকের আহ্বানমতো পরবর্তী সাক্ষী মিসেস আরতি মিত্রের নাম ঘোষিত

হল। পাশের ঘর থেকে আরতি এল সাক্ষ্য দিতে। ইতিপূর্বে আদালতে কী কথোপকথন হয়েছে তা সে জানে না। অশোক প্রশ্নের মাধ্যমে তার নাম, পেশা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে জানতে চাইল, মিসেস মিত্র, আমি যেদিন আপনাদের রিসেপশান কাউন্টারে যাই সেদিনকার কথা আপনার মনে আছে?

আরতি সপ্রতিভের মতো বলে, কিছু কিছু নিশ্চয় মনে আছে।

— আপনার কি মনে আছে যে, আপনাদের চীফ নিউজ এডিটার যখন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে অস্বীকৃত হলেন, তখন আমি মিস্টার শচীন দাশশর্মার সঙ্গে দেখা করতে চাই?

—হ্যাঁ, মনে আছে।

—আপনি নিউজ সেকশানে ফোন করেন, এবং সেটা ধরেন নিউজ এডিটার — তাই নয়?

—হ্যাঁ, তাই।

—তারপর তখন উনি আমাকে বলেন....

বাধা দিয়ে আরতি বলে, সরি স্যার, তখন টেলিফোনের রিসিভারটা আপনার কানে, আমি জানি না, উনি কী বলেছিলেন!

—দ্যাটস্ জাস্টিফায়েড। কিন্তু তাঁর কথা শুনে আমি টেলিফোনের কথা-মুখে কী বলেছিলাম, সেটা কি আপনার মনে আছে?

—ইফ আই রিমেম্বার কারেক্টলি, আপনি বলেছিলেন, ''আমি সামান্য মধ্যবিত্ত মানুষ...''

—ইয়েস! আর তখনই ও প্রান্তের স্পীকার এত জোরে কথা বলতে থাকেন যে, আমি যন্ত্রটা আমার কান থেকে ইঞ্চিচারেক দূরে ধরে রাখি। সে সময় উনি যা বলছিলেন তা আমি-আপনি দুজনেই শুনতে পাচ্ছিলাম। তাই নয়?

আরতি জবাব দিতে ইতস্তত করছে দেখে অশোক পুনরায় বলে, আপনাদের চীফ নিউজ এডিটার অত্যন্ত চিৎকার করে কথা বলছিলেন বলে আমি যন্ত্রটা দূরে ধরে রেখেছিলাম, এটুকু কি আপনার মনে আছে?

—হ্যাঁ, মনে আছে।

—কত দূরে?

—তা চার-পাঁচ ইঞ্চি।

—আর আপনার কান থেকে কত দূরত্বে?

আরতি ইতস্তত করে বললে, আমার মনে নেই!

—তবু আন্দাজ?

—ছয় ইঞ্চি হবে হয়তো।

—তার মানে যন্ত্রটা ছিল আমাদের দুজনের কানের মাঝামাঝি, তাই নয়?

—ঠিক মাঝামাঝি কিনা আমার মনে নেই।

— কিন্তু একথা নিশ্চয় মনে আছে যে, আপনি আমাকে বলেছিলেন...

মহেন্দ্র দত্ত আপত্তি তোলেন, অবজেকশান! লীডিং কোশ্চেন।

বিচারক বলেন, আপনি অন্য ভাবে প্রশ্ন করুন।

অশোক বলে, অল রাইট। মিসেস্ সেন, টেলিফোন যন্ত্রটা যথাস্থানে রেখে আপনি কোন একটি কথা আমাকে বলেছিলেন কি? বলে থাকলে : কী?

আরতি ইতস্তত করে বললে, আমি বলেছিলাম, আয়াম সরি।

—তার মানে আপনাদের চীফ নিউজ এডিটার কী বলেছেন তা আপনি নিশ্চয় শুনতে পেয়েছিলেন। সেজন্যই দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন, তাই নয়?

—হ্যাঁ! তাই!

—কী বলেছিলেন উনি? যা আপনি-আমি দুজনেই শুনতে পাই?

—উনি বলেছিলেন, ''আপনি খুন জখম- আত্মহত্যা যা ইচ্ছে করতে পারেন, কিন্তু আর আমাদের বিরক্ত করতে আসবেন না!''

আদালতে একটা চাঞ্চল্য লাগে।

দর্শকের আসন থেকে কাঁপতে কাঁপতে ভৈরব লাহিড়ী বোধ কার নিজের অজান্তেই উঠে দাঁড়ায়!

ম্যাজিস্ট্রেট তার দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তর্জনী নির্দেশে গর্জে ওঠেন, য়ু দেয়ার! সিট ডাউন!

ভৈরব কাঁপতে কাঁপতে বলে, বাট য়োর অনার....

—আই সে, সিট ডাউন! ইফ য়ু ডোণ্ট ওয়াণ্ট টু গো বিহাইন্ড দ্য বারস!

ভৈরব বসে পড়ে!

দু একটি পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা পত্রিকা অফিসে টেলিফোন করতে ছুটল। ক্যামেরাম্যান ক্যামেরায় বিল ভরে তৈরী হয়ে নিল—যাতে আদালত প্রাঙ্গণের বাইরে এলেই ভৈরবের ফটো নেওয়া যায়। আর অশোকের। ম্যাজিস্ট্রেট হাতুড়িটা ঠুকে বললেন, অর্ডার! অর্ডার!

অশোক বললে, প্লীজ স্টেপ ডাউন, মিসেস্ মিত্র। আর আমার কোন জিজ্ঞাসা নেই।

একথা বলেই অশোক বিচারকের দিকে ফেরে। বলে, য়োর অনার! আপনি অনুমতি করলে আমি 'প্লী'-টা পরিবর্তন করতে চাই। এতক্ষণে আমি প্রমাণ করেছি— না, 'নট্ গিল্টি' নয়, আমি স্বীকার করছি, আমি 'গিল্টি'!

বিচারক রীতিমতো বিস্মিত। অবাক হয়ে বলেন, মামলার এই পর্যায়ে?

—ইয়েস! য়োর অনার! না হলে ঐ ইয়াঙ্গো জার্নালিস্ট ভদ্রলোককে তাঁর সাক্ষ্যের বাকি অংশটুকু দেবার জন্য আবার কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াতে বলতে হয়।

বিচারক একটু ইতস্তত করেন পরবর্তী প্রশ্নটি করতে। তারপর মনস্থির করে পি.কে. বাসুর দিকে ফিরে জানতে চান, আপনার এতে কোন আপত্তি নেই?

—আজ্ঞে না। ইট্‌স হিজ প্রিভিলেজ!

—মিস্টার পি. পি.? আপনার?

—নান্‌ হোয়াট-সো-এভার। আসামী যদি নিজেই স্বীকার করেন যে, তিনি দোষী তখন আমার আপত্তি করার কী হেতু থাকতে পারে?

ম্যাজিস্ট্রেটের তবু আশঙ্কা হয়, কোথাও কিছু একটা ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। প্রায়-জেতা-মামলা আসামী এভাবে স্বেচ্ছায় হারতে বসল কেন? তাই তাকেই বলেন, লুক হিয়াব মিস্টাব মুখার্জি, আপনি মিস্টাব দাশশর্মাব বাড়িতে গিয়েছিলেন, কলবেল বাজিয়েছিলেন, তাবপব তিনি যখন আপনাব সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃত হন তখন তাঁব নাকে একটা ঘুষি মাবেন। পবে আপনিই থানায় গিয়ে একটা অ্যাসল্টেব কেস্‌ ডাযেরি লেখান। এই কথাই বলতে চাইছেন তো?

— ইয়েস, যোব অনাব।

—আপনি কি আর কোনও সাক্ষীকে ডাকবেন অথবা আর কোনও এভিডেন্স দাখিল করবেন?

—নো, যোব অনার। কিন্তু মিটিগেশনেব জন্য আমি কেসটা এই 'ডক' থেকে 'আর্গু' কবতে চাই—উইথ যোব কাইণ্ড পাবমিশন!

—দিস্‌ ইজ য়োর প্রিভিলেজ অ্যান্ড রাইট! প্লীজ প্রসীড—

দর্শকের আসনে উপবিষ্ট মালতী তাব স্বামীর কর্ণমূলে জানতে চায: 'মিটিগেশন' মানে কী গো?

সিতাংশু জনান্তিকে বুঝিয়ে দেয: অশোক আইনেব ধারা মোতাবেক অপরাধ স্বীকাব করছে; কিন্তু যে ঘটনা পবম্পবায় অপরাধযোগ্য দুর্ঘটনাটা ঘটেছে তার পারম্পর্য ব্যাখ্যা করে অপবাধেব গুরুত্ব হ্রাস করাতে চাইছে এখন।

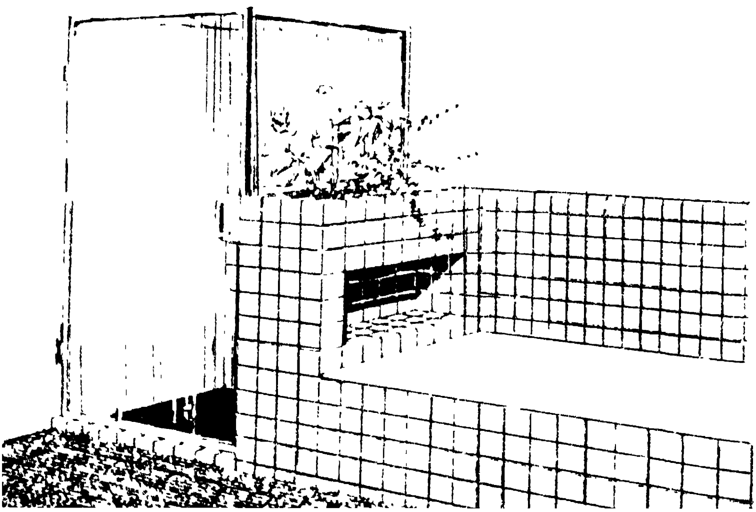

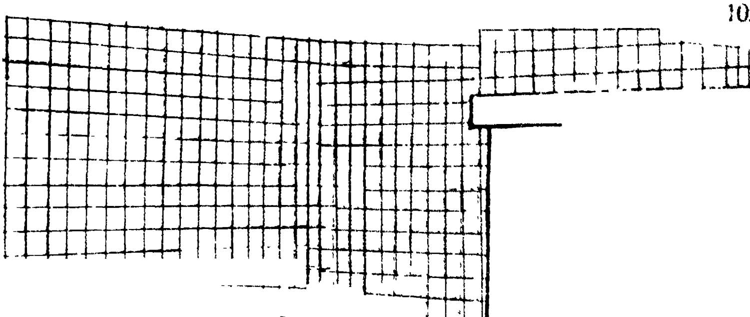

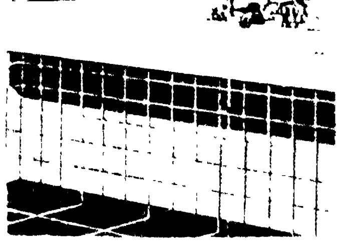

—য়োর অনার! এটি একটি ম্যাসল্টের কেস। দেখা যাচ্ছে, যাঁর বিরুদ্ধে অ্যাসল্টের চার্জ আনা হয়েছে তাঁর বয়স ছত্রিশ, কিন্তু এই ছত্রিশ বছরের জীবনে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও চার্জ কখনো গঠন করেনি পুলিস। এ থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তিনি একজন 'ল-অ্যাবাইডিং সিটিজেন'। আইন-সচেতন সাধারণ নাগরিক। না, সাধারণ ঠিক নয়! সাধারণ নাগরিক আজকাল কোথাও কোনও অ্যাসল্টের কেস হলে নিজে উদ্যোগী হয়ে থানায় তা রিপোর্ট করতে যায় না। পথে ঘাটে কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেখলে পাশ কাটায়। এ-ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বয়ং থানায় গেছিলেন কেস ডায়েরি লেখাতে। থানার ও. সি. তাঁর আঠারো বছরের অভিজ্ঞতায় স্বীকার করেছেন এমন ঘটনা তিনি ইতিপূর্বে ঘটতে দেখেননি....

—দ্বিতীয়ত, ও. সি. আরও স্বীকার করেছেন, যে পাড়ার লোকের হাতে মার খেয়ে দ্বাররুদ্ধ করার ঘটনাও তাঁর অভিজ্ঞতায় নেই। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে যে-লোকটা ঘুষি খেয়ে তা হজম করল সে কি গিল্টি-কনশাস্? নিজের অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন? সম্ভবত তাই। আর সেজন্যই ও. সি. কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে নাকে তোয়ালে চাপা দিয়ে আক্রান্ত ব্যক্তি বলেছিলেন না, যে তাঁকে বাড়ির দোরগোড়ায় এসে ঠেঙিয়ে গেল সেই লোকটার বিরুদ্ধে তাঁর বা তাঁর এম্প্লয়ারের কোনও অভিযোগ নেই।

—এই প্রসঙ্গেই প্রথম উত্থাপিত হয়েছে আক্রান্ত ব্যক্তির এম্প্লয়ারের কথা। পূর্বভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত, সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি দৈনিক পত্রিকার নাম। বস্তুত মামলা চলাকালে আমরা প্রমাণ করেছি ঐ যে 'ল-অ্যাবাইডিং সিটিজেন' ক্ষণিক উত্তেজনায় একটা অপরাধ করে বসলেন তার মূলে আছে সেই 'সঞ্জয় উবাচ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটা ভ্রান্ত সংবাদ। য়োর অনার! আমরা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছি যে, সংবাদটা ভুল—ভেঙে পড়া বাড়ির কেস-এই মামলার অভিযুক্তকে পুলিস খুঁজছে না, তার বাড়ি রেইড হয়নি। অথচ ঐ ভুল

সংবাদ পরিবেশনের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির আর্থিক ক্ষতি হচ্ছিল। সমাজে সে বিড়ম্বিত হচ্ছিল, তার শিশুপুত্রকে স্কুলের ছেলেরা টিটকারি দিচ্ছিল, মেরে মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছিল। আজকের এই মামলার আসামী সেই শান্তিকামী মানুষটি কী চেয়েছিলেন? ঐ পত্রিকার কাছে ... একটু সুবিচার। একটা সংশোধনী সংযোজন! তিনি পত্রিকা-সম্পাদককে প্লীডার্স নোটিস দিয়েছেন, চিঠি লিখেছেন, বারে বারে টেলিফোন করেছেন, স্বয়ং পত্রিকা-অফিসে গিয়ে তাঁর দুঃখের কথা জানাতে চেয়েছেন। কেউ কর্ণপাত করেনি—বাস্তবে যে মহল সহানুভূতির সঙ্গে ওর অভিযোগটা হয়তো শুনতেন, প্রতিকার করতেন, সেই উপর-মহল পর্যন্ত তিনি পৌঁছাতেই পারেননি। ঐ ইয়াংলো জার্নালিস্ট ভদ্রলোক ব্যূহমুখে জয়দ্রথের ভূমিকায় পথ আগলে দাঁড়িয়েছিলেন। মদমত্ত হুঙ্কার ছেড়েছিলেন: ''আপনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন - খুন জখম আত্মহত্যা!''

....স্বীকার্য, আক্ষরিক অর্থে তিনি আবেদনকারীকে খুন-জখম বা আত্মহত্যা করতে বলেননি; কিন্তু এটাও স্বীকার্য যে, ঐ ভাষায় ক্ষমতাদর্পী চীফ নিউজ এডিটার বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, সাধারণ মানুষ আর তাদের প্রিয় পত্রিকার মাঝখানে একটা পাঁচিল উঠে গেছে, যা অনতিক্রম্য।

য়োর অনার! আপাতদৃষ্টিতে ঐ চীফ নিউজ এডিটারের মাঝের সাজেস্‌শানটা আবেদনকারী গ্রহণ করেছিল; কিন্তু তার প্রয়োগ হয়েছে অতি মৃদুভাবে। খোঁজ নিলে আপনি জানতে পারবেন হুজুর, অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাত্রজীবনে বক্সিং-এ মিডল ওয়েট চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। অথচ তার ঘুষিটা এতই কম জোরে মারা, যাতে ঐ সাংবাদিক ভদ্রলোকের নাকের কার্টিলেজ থেঁৎলে যায়নি। তাকে হাসপাতালে যেতে হয়নি, এমনকি ডাক্তার পর্যন্ত ডাকতে হয়নি। কেন? একমাত্র হেতু: আসামী ওঁকে 'জখম' করতে চায়নি, চেয়েছিল মুষ্ট্যাঘাতের মাধ্যমে শুধুমাত্র একটা প্রতিবাদ জানাতে। সে প্রতিবাদ ঐ পত্রিকার বিরুদ্ধেই শুধু নয়। এই সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। যেখানে গরিব মানুষ অপমানিত হলে বড়লোকের বিরুদ্ধে অসহায়। আলোচ্য সংবাদপত্রটি মহাভারতের সঞ্জয়ের ভূমিকাটা পালন করতে চায়। যেন হৌসের মতে পাঠক হচ্ছে ধৃতরাষ্ট্রের মতো অন্ধ, আর পাঠিকা গান্ধারীর মতো স্বেচ্ছায় দৃষ্টিহীনা। সঞ্জয় যে 'সন্দেশ' পাঠক-পাঠিকাকে গেলাবেন, তাই তারা গিলতে বাধ্য।

মহেন্দ্র দত্ত উঠে দাঁড়ান: অবজেকশান; ইর্‌রেলিভেন্ট!

বিচারক বলেন, মিস্টার মুখার্জী, আপনি আপনার বক্তব্যকে প্রাসঙ্গিক ঘটনার দিকে সূচীমুখ করুন।

—তাই করছি, য়োর অনার! কিন্তু ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতেই যে রয়েছে ঐ বহুল-প্রচারিত পত্রিকার মুষ্টিমেয় ক্ষমতাদর্পী হর্তাকর্তা—যাঁরা ধরাকে সরা জ্ঞান করেন; সম্পাদকীয় দপ্তরকে যাঁরা সাধারণ পাঠক-পাঠিকার কাছে

'আন-অ্যাপ্রোচেব্‌ল্' করে রেখেছেন। নাগালের বাইরে। তাঁরা ভুলে যান, পূর্বভারতের এই প্রখ্যাত পত্রিকার জনপ্রিয়তার জন্য কৃতিত্ব তাঁদের প্রাপ্য নয়, সে কৃতিত্ব তাঁদের পূর্বসূরীদের, যাঁদের অনেকেই আজ প্রয়াত। প্রাক স্বাধীনতা যুগ থেকে নিরলস নিষ্ঠায় এই পত্রিকা দশকের পর দশক সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ জনসমক্ষে তুলে ধরেছে। যেখানে অন্যায়, যেখানে দুর্নীতি, সেখানেই সে সততার সঙ্গে সাংবাদিকের সত্যাশ্রয়ী নিষ্ঠায় বাস্তব ঘটনা 'ব্যক্ত' করেছে। রাজনৈতিক হর্তা কর্তাদের হুমকিতে সে ভ্রূক্ষেপ করেনি। বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্রী, মায় মুখ্যমন্ত্রী---- দুর্নীতি পরায়ণ প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই সে নির্ভীক স্পষ্টবক্তা! এজন্য নিগ্রহও কম সইতে হয়নি তাকে, প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক বজরংবলীদের কাছে। মজদুর ইউনিয়নকে কব্জা করে, রাস্তার মধ্যে মারধোর করে একদিন এই বর্তমানকালের ইয়ালো জার্নালিস্টদের পূর্বসূরীদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার চক্রান্ত করা হয়েছিল। তবু তাঁরা সাংবাদিক নিষ্ঠায় অচঞ্চল থেকেছেন! স্পষ্ট কথা বলার অপরাধে যখন সরকার সাংবাদিককে কারাগারে নিক্ষেপ করে তার কণ্ঠ রোধ করতে চেয়েছে তখনও তাঁরা আর্তনাদ করে গর্জে উঠেছেন : আমাকে বলতে দাও! ....

আশাকরি মাননীয় কাউন্সেল এইসব তথ্যকে 'ইর্‌রেলিভেন্ট' বলবেন না।

মহেন্দ্র দত্ত নথিপত্রে নিমগ্নদৃষ্টি হয়ে শুনতে না পাওয়ার অভিনয় করেন।

বিচারপতি বলেন, আপনি শুধু আদালতকে সম্বোধন করে লিটিগেশান আর্গু করুন, মিস্টার মুখার্জী।

—তাই করব, য়োর অনার! এবার তাই বলব : দুর্ভাগ্য, নিতান্তই দেশের দুর্ভাগ্য, সেই জনপ্রিয় পত্রিকার বিভিন্ন স্তরে ইদানীং কিছু ঘোলা জল ঢুকে গেছে। এই হৌস থেকে একটি সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকা বহুদিন ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। এককালে বাঙলা সাহিত্যের একাধিক সেরা রচনা এই সাপ্তাহিকেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এখনো বহিরঙ্গে সেটি বাঙলাভাষায় অদ্বিতীয় সাপ্তাহিক। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে সেই সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্মুখের দিকে 'চিঠিপত্র' বিভাগের খানকয় পৃষ্ঠা ছাড়া প্রায় বাকি অংশটা পাঠযোগ্য নয়! সেখানেও এসে থানা গেড়েছেন হৌসপুষ্ট আধডজন কথা-সাহিত্যিক : একটি অনবদ্য 'হিভিয়াস হেক্সাগন'! পর্যায়ক্রমে ঐ ছয়জনের ধারাবাহিক ট্র্যাশ একের পর এক ছাপা হয়। হাবিতের 'অবরোহণ'-এর পরে পদাধিকার বলে লাবিতের 'অধঃপতন'! সেটা 'আগামী সংখ্যায় সমাপ্য' ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সাইক্লিক অর্ডারে পরবর্তী কথাশিল্পী জারিতের 'কাঁথা কম্বল'! আলালের ঘরের ঐ হাফ আ-ডজন দুলালের প্রলাপোক্তি....

মহেন্দ্র দত্ত প্রবল আপত্তি জানান : মামলার পক্ষে এ সব কথা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

ম্যাজিস্ট্রেট অশোককে 'অ্যাডমনিশ্ ' করেন। মৃদু ধমকের পর্যায়ে সেটা।

অশোক বলে, আয়াম সরি, য়োর অনার! সহযোগীর মতে ঐ পত্রিকার অতীত গৌরবগাথা প্রাসঙ্গিক অথচ বর্তমান অধঃপতনের ইতিকথা অপ্রাসঙ্গিক। ধরুন, আমার বাড়িতে এবং অফিসে টেলিফোন আছে—'মুখার্জী অ্যাণ্ড অ্যাসোসিয়েটস্' এণ্ট্রিতে। ফলে সাংবাদিক আমাকে ডিফেম করার আগে অনায়াসে টেলিফোন করে তথ্যের যাথার্থ্য যাচাই করেতে পারতেন। নিউজ এডিটার নিজেও তা করতে পারতেন। কিন্তু এসব ওঁরা প্রয়োজন মনে করেন না। অর্ধশতাব্দীর নিরলস পরিশ্রমে বিগত যুগের সাংবাদিকেরা যে 'ইমেজটা' গড়ে তুলেছেন সেই দুর্গের আড়াল থেকে এরাঁ যথেচ্ছাচার করতে সাহস পান। পার্টি-ক্যাডারদের অত্যাচারের ব্যাপারে পার্টি-লীডাররা যেমন সবাই ধৃতরাষ্ট্র—এক্ষেত্রেও নিচুতলার এইসব দুর্ব্যবহার কর্তাব্যক্তিরা দেখেও দেখেন না। এঁদের ধারণা সংবাদ আর সাহিত্যের মনোপলি বাজারটা ওঁরা পকেটে পুরে ফেলেছেন। কথাটা আংশিক সত্য! ওঁদের সহযোগী একটি পত্রিকা—প্রাক-স্বাধীনতা যুগ থেকে যাঁরা সমান্তরাল অভিযাত্রায় সাংবাদিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে পাশাপাশি এগিয়ে আসছিলেন, তাঁরা মহাকালের অঙ্গুলি-হেলনে সম্প্রতি মঞ্চের নেপথ্যে চলে গেছেন। ক্ষমতাদপের্র অপরাধে নয়, স্বজনপোষণের মাত্রাতিরিক্ত আধিক্যে। মুরুব্বিহীন দক্ষ কর্মীদের গোঁত্তা মেরে সরিয়ে ঐ সব অযোগ্য ভাইপো-ভাগ্নে আর তাদের মোসাহেব-দল সিঁড়ির ল্যান্ডিঙে-ল্যান্ডিঙে পানের পিক ফেল্‌তে ফেল্‌তে এত উপরে উঠে গেলেন যে, গোটা পত্রিকাখানাই উঠে গেল। মজদুর ইউনিয়নের অন্তর্ঘাতী আক্রমণে 'সঞ্জয় উবাচ' ধরাশায়ী হয়নি, কিন্তু এক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন শিশুমঙ্গল হাসপাতালের মতো....

এবার বিচারক নিজেই ওকে ধমকে ওঠেন, প্লীজ, মিস্টার মুখার্জী! আপনি ক্রমাগত অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার অবতারণা করেছেন! 'সঞ্জয় উবাচ' পত্রিকা এ-মামলায় রেলিভেন্ট; কিন্তু তার কোনও সহযোগী পত্রিকা নয়। প্লীজ বি ব্রিফ অ্যান্ড টু দ্য পয়েন্ট।

—আয়াম সরি এগেন, য়োর অনার। আমি শুধু 'সঞ্জয় উবাচ' পত্রিকার কথাই বলি। বলছিলাম যে, ওঁদের মতে ওঁরা সংবাদ আর সাহিত্যের বাজারটা পকেটে পুরে ফেলেছেন। মনোপলি বিজ্‌নেস! তারাশঙ্করের সেই কথাটা ওঁরা নীতিবাক্যরূপে গ্রহণ করেছেন: যেখানে চামড়ার জুতো চলে না, সেখানে চাঁদির জুতো চালাতে হয়। নতজানু হতে যাঁরা অস্বীকৃত তাঁরা তাঁদের 'অভিলাষ' অন্যত্র চরিতার্থ করতে পারেন। কথাসাহিত্য রচনার চূড়ান্ত সাফল্যলাভে লেখিকা 'জ্ঞানপীঠ' পেয়েছেন কিনা সেটা কোনও ফ্যাক্টর নয়; নির্জন 'পঞ্চতপা' সাধনায় পাঠক-মানসে কোন কথাসাহিত্যিক সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন কিনা এটা কোন বিচার্য বিষয় নয়। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে ওঁদের সুরক্ষিত কায়েমি স্বার্থের 'ঠাঁই

নেই' দুর্গে বহিরাগতর প্রবেশ নিষেধ! আর নিচুতলার এই অবস্থা সম্বন্ধে উঁচুতলা ধৃতরাষ্ট্র!

—তাই আমি 'প্লী'টা বদল করতে চাই, য়োর অনার! ভোট দিয়ে যাঁদের দেশশাসক বানিয়েছি— তারা হয়ে উঠেচে দেশশোষক! পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসিতে এর একমাত্র প্রতিষেধক : স্ট্রং অপোজিশান : দুর্নীতিমুক্ত শক্তিশালী বিরোধীপক্ষ! এ-দেশে সেটা আকাশকুসুম! কী প্রাদেশিক সরকারে, কী কেন্দ্রে' সবত্রই শুধু পার্টিবাজি, গ্রুপবাজি, নির্লজ্জ খাওয়া-খাওয়ি। পার্টি নেতৃত্বে উপবে ওঠার জন্য সহযোদ্ধাকে লেঙ্গি মারা।

—এই যখন দেশের অবস্থা তখন কাব দিকে ভরসা করে তাকাবে নিপীড়িত দেশের সাধারণ মানুষ? শেষ ভরসাস্থল ছিল : সংবাদপত্র; শেষ আশ্রয়স্থল ছিল সাহিত্যিকেরা।

রামমোহন—বিদ্যাসাগর— বঙ্কিম— হবিশচন্দ্র— দীনবন্ধু— রবীন্দ্রনাথের উত্তবসূরীবা। কিন্তু ঐ মুষ্টিমেয় ক্ষমতাদর্পীব বিকৃতচিন্তায় আমরা সেখানেও আশাহত। ঐ হারিত-জারিত-লারিত গবেষণা কবে জানাচ্ছেন : ''রামমোহন রায় কিংবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুবেব ডিনার টেবিলে সুবাপান''-এর আয়োজন হত এবং সেটাই তাঁদের বিষয়ে মুখ্য আলোচ্য-বিষয়! বঙ্কিম বাঙলা লিখতে ঠিক জানতেন না। আর হরিশচন্দ্র মুখার্জী—সেই আর্দশ সাংবাদিক, যিনি নীলবিদ্রোহেব বার্তা তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করার প্রচেষ্টায় বস্তুত প্রাণ দিলেন— তাঁর সম্বন্ধে এঁদের বক্তব্য ''দেশপ্রেমিক হরিশ মুখার্জীর পরদারগমনেব উল্লেখই অনেকেব কাছে ভযাবহ মনে হয।''

সবচেয়ে কৌতুককর পরিস্থিতি যখন হৌসপুষ্ট বামন-কবি বিদূষকেব ভূমিকায় বাহ্বাস্ফোট করেন। তারকার মুখে একমুঠি ছাই দিয়ে আসাব দুবন্ত বাসনাটা তাঁর চাগে। কালিদাসকে হারিয়ে দিয়ে জোড়াসাঁকোর বাউলকবি নাকি একবার নেচেছিল। সেই সুবাদে হৌস-কবি হাউই-কবি হয়ে হা-হুতাশ শুরু করে, ''রবীন্দ্র রচনাবলী পদাঘাতে পাপোসে লুটিয়ে দেবার'' বাসনা তাঁব জাগে। কিন্তু তাবপর দেশ-এর পাঠক-পাঠিকা কী পড়বে?...কেন? রবীন্দ্রত্তোর বামন-কবির প্যাব-মহব্বতের কিস্‌সা-কবিতা :

''অরুন্ধতী! সর্বস্ব আমার!
হাঁ করো! আ-আলজিব চুমু খাও!''

কবিপ্রিয়ার প্রত্যুত্তরটুকু আর ঐ নিবিড় প্রেমের কবিতায় লিপিবদ্ধ করে যাননি প্রখ্যাত হৌস-কবি। সোনাগাছিব সোনার মেযে কবিকে জবাবে বলেছিল :

''আর না! আলজিভ-তক্ চুমু কেউ খায় নাকি?
তুমিই বরং আর খেওনি, বাবু!

চাব পেগে অমন কোঁৎকা কেতাবখান্ নাতি মেরে পাপোসে পাড়ি ফেল্‌লে!
পাঁচ পেগে আমারে হাঁ করতি বুল্‌ছ!
শশ হ্যাঁ নাগব! তোমার অরুনধুতি কি হাঁ-করা মেয়ে?
আব খেওনি!
ছয পেগে তোমার সেই বিপরীত-ভীমরুতি শুরু হয়ে যাবে নে...
' অরুনধুতি, পরুন ধুতি, নীল-নোহিতে পইবে দে' শাড়ি...''

মহেন্দ্র দত্ত হুঙ্কাব দিয়ে ওঠেন: অবজেকশান! ইর্‌বেলিভেন্ট অ্যাণ্ড অবসীন!

অশোক তৎক্ষণাৎ মেনে নেয়: একশ বার! সাময়িক পত্রিকাব এইসব পোযা-কবি আর কথা-সাহিত্যিক বাংলা-সাহিত্যে শুধু ইববেলিভেন্ট নয়, অবসীন! তাদেব রচনাবলী পদাঘাতে পাপোসেও ফেলা যাবে না, কাবণ পাপোসটা পয়সা দিয়ে কেনা! ইযেস, যোর অনাব, সাংবাদিকতাব এই অবক্ষয আর সাহিত্যেব এই ভয়াবহ অপমৃত্যু দেখে মনে হচ্ছে— এদেশে বেঁচে থাকাটাই পাপ! আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর! ''মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে চেয়েছি''—সেটাই আমার অপরাধ! আপনি আমাব শাস্তি বিধান করুন, ধর্মাবতার!

বিচারক ঘূর্ণমান ইলেকট্রিক ফ্যানটার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, আদালত এটা মেনে নিয়েছেন যে, আপনাব প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে কোনও মানুষ আইনকে নিজেব হাতে তুলে নিতে পারে না। সেজন্য অভিযুক্ত মিস্টাব অশোক মুখার্জী, আর্কিটেক্টকে আমি দোষী সাব্যস্ত করলাম এবং এক টাকা আর্থিক জরিমানা করলাম। মামলার খরচ যে-যার ভাগে বহন কববে!

অশোক পকেট থেকে একটা এক টাকার নোট বার করে এগিয়ে গেল জরিমানা দিতে।

আদালতের নির্গমনপথে তাকে দুদিক থেকে দুজনে চেপে ধরল। অশোকের সঙ্গে হাত ধরে চলেছে মিঠুন। পাশে পাশে অলকা। পিছনে মালতী আর সিতাংশু।

কয়েকটি ক্যামেরাধারী ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে। তাদের হাতে ফ্ল্যাশ-বাল্ব ঝিলিক হানল!

—দাঁড়ান মশাই!—বজ্রকণ্ঠে পাশ থেকে কে যেন বলে ওঠে।

অশোক পাশ ফিরে দেখে শচীন, ভৈরব এবং আরও কয়েকজন, বোধ করি সঞ্জয়-হৌসের কর্মীবৃন্দ।

ভৈরব বলে ওঠে, কী ভেবেছেন আপনি? পার পেয়ে যাবেন? মদ্যপ, মিথ্যাবাদী, ইয়োলো-জার্নালিস্ট, যা-ইচ্ছে তাই বলেছেন! মগের মুল্লুক এটা? আমরা মানহানির মামলা আনব আপনার নামে! হেভি ড্যামেজ স্যু করব!

অশোক একগাল হেসে বললে, 'মান মানে কচু' ভৈরবদা! বিধানসভায় বিধায়ক,

পার্লামেন্টে সাংসদ, আর ওকে দাঁড়িয়ে ডিফেন্ডার হলপ-না নিয়ে যা বলে তার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করা যায় না। বিশ্বাস না হয় ঐ তো মহেন্দ্রবাবু দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁকেই জিজ্ঞাসা করে দেখবেন। আর নেহাৎই যদি মনে করেন আপনার 'মান'-এ কোনও হানি হয়েছে তাহলে কাল সকালে এসে আমার বাড়ি কলবেল বাজাবেন! আমি দরজার পাল্লা দুটো ফাঁক করে নাক বাড়িয়ে শুনব আপনার অভিযোগ!

মিঠুন ওপরপরা হয়ে বলে ওঠে, বাপি চ্যাম্পিয়ান বক্সার কিন্তু!

অশোক আবার একগাল হেসে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। ঐ একটা অসুবিধে আছে বটে! মিড্‌ল্‌ ওয়েটে একবার চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলাম। আচ্ছা চলি, নমস্কার!

পরদিন সকালে এক অপ্রত্যাশিত চমক।

তখনো ভালো করে ভোর হয়নি। কলবেল বাজল অশোকের বাড়িতে। কাল শুতে রাত হয়েছে। অনেক রাত পর্যন্ত নানান বন্ধু-বান্ধবদের টেলিফোন পেয়েছে। সিতাংশু-মালতী ক্লাব থেকে চাও-মিন চিলি-চিকেনের প্যাকেট নিয়ে এসেছিল, সবাই মিলে তা ভাগ করে খেয়েছে। কিন্তু এত ভোরে ডোরবেল বাজায় কে?

অশোক বিছানা থেকে নেমে চটিটা পায়ে গলাচ্ছিল, হঠাৎ অলকা ওর হাত চেপে ধরে— না! দরজা খুলো না!

—মানে?

—কাল ভৈরব লাহিড়ীকে কী বলেছিলে মনে নেই। ওরা যদি দল বেঁধে এসে থাকে?

—কী পাগলের মতো বকছ অলকা? আমার বাড়িতে এসে আমাকে ঠেঙিয়ে অক্ষত ফিরে যাবে? ক-জন এসেছে ওরা? পাঁচ-সাত-দশজন?

—ক্রিরিং...ক্রিরিং....ক্রিরিং....

উত্তেজনায় মিঠুনও উঠে বসেছে খাটের উপর।

অশোক একেবারে খালি হাতে এগিয়ে গেল। সদর দরজা খুলে দিল তৎক্ষণাৎ। চৌকাঠের ও-প্রান্তে একটা সাইকেলে ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন বেসরকারী পিয়ন। তার হাতে একটা পিওন-বুক আর ভারী একটা ম্যানিলা খাম।

—চিঠিটা নিয়ে একটা সই দিয়ে দিন, স্যার।

অশোক বিনা বাক্যব্যয়ে খামটা নিয়ে সই দেয়।

পিয়ন পিছন ফিরতেই দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

অলকাও এগিয়ে এসেছে, কার চিঠি গো? এত ভোরে?

ততক্ষণে খামটা খুলে ফেলেছে। তাতে একটা খবরের কাগজ। আজকের 'সঞ্জয়-উবাচ'। সঙ্গে একটা স্লিপ: সম্পাদকের শুভেচ্ছাসহ। সংবাদপত্রে গতকালকার মামলার বিবরণটা সংক্ষিপ্ত কিন্তু নির্ভুল। ফাউন্টেন-ইংকে বক্স-ইন

করা। আর চিঠিপত্র বিভাগে একটা বক্স-ইন করা নিউজ লাল কালিতে চিহ্নিত :

সাতই জুন, পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ সংশোধন করা হয়েছে। সন্দীপ ধনপতিয়ার ভেঙে-পড়া বাড়ির স্থপতিবিদের নাম হিসাবে পরদিন 'মুখার্জী অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট্স্' প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করা হয়েছিল। আরও বলা হয়েছিল সে রাত্রে পুলিস ঐ আর্কিটেক্ট-প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী শ্রী অশোক মুখার্জীর বাড়ি বেড করে। পরে জানা গেছে— এ সংবাদটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ঐ ভেঙে-পড়া বাড়ির আর্কিটেক্ট ঐ প্রতিষ্ঠান নয় এবং শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায় ঐ মামলার সঙ্গে কোন ভাবেই যুক্ত নন। এই অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্ত-সংবাদ প্রকাশ করায় সম্পাদকদপ্তর দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

অলকা বলে, কই বললে না? কার চিঠি?

—'সঞ্জয় উবাচ' সম্পাদকের!

—কী লিখেছেন উনি?

—উনি ঝানু হালদারের অ্যাবস্ট্রাক্ট কথাটার একটা কংক্রিট প্রমাণ দিলেন!

—কী বলেছিলেন ঝানু হালদার?

—কোট, 'যদিও ওরা আমাদের বিরুদ্ধপক্ষের—উঠতে-বসতে আমাদের গালমন্দ করে, এবং যদিও ওরা পুঁজিপতিদের স্বার্থ দেখে আর আমরা জনগণের, তবু বলব 'সঞ্জয়-উবাচ'র সম্পাদক—কমরেড না হওয়া সত্ত্বেও—একজন ভদ্রলোক'— আনকোট।